মূল্য ১২.০০ টাকা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

শিল্পী চিত্ত সরকার

মতী শান্তি সান্যাল ১০৬/১ আমহার্স্ট স্ট্রিট কলিকাত

হইতে । শদ পাত্র, সত্য[illegible] প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায়

অনেক লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। আমিও তার মধ্যে একজন ছিলাম। আমি, বিমল, বিমলেন্দু বিশ্বাস।

একটা পুরনো বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। হাতুড়ি, শাবল, গাঁইতি হাতে অনেক লোক খাটছে। ক্ষণে ক্ষণে ইট, বালি, চুন, সুরকি হুড়মুড় করে পড়ছিল। পড়ে সত্ত আঁচ দেওয়া কয়লার উনুনের ধোঁয়ার মতন পাক খেয়ে, কুণ্ডলী পাকিয়ে, ওপর দিকে উঠছিল। ছড়িয়ে যাচ্ছিল চারধারে। হাওয়া ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কিছু, কিছু থিতিয়ে নেমে আসছিল নিচে। অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল জায়গাটা। সে অন্ধকার কেটে যেতে না যেতে আবার দু'চারটা চাবড়া খসে পড়ছিল। ভাঙার শব্দ, কড়ি বরগা খসে পড়ার শব্দ, মজুরদের হৈ-হৈ চিৎকার আবছা-অন্ধকার ও ওই উড়ন্ত বালি-চুন-সুরকির গন্ধে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। একটা তীব্র সুখ ও উত্তেজনা রক্তে উত্তাল হয়ে বইছিল।

'হট যাইয়ে বাবু, হট যাইয়ে।'

হঠাৎ এই চিৎকার আমার সম্বিৎ ফিরিয়ে দিল। আমি কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম। এবং চিন্তা করলাম: কেন আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি? এতগুলি মানুষ কী জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে আছে? কী দেখছি আমরা সকলে? একটা বাড়ি চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ছে, একটা উদ্ধত উন্নত সুন্দর কিছু ভেঙে পড়ছে, এই দেখতে? কিছু ধ্বংস হোক, লুপ্ত নিশ্চিহ্ন হোক, এই কী আমরা চাই, ভালবাসি? কিংবা মুক্তি? এই ধ্বংসের মধ্য দিয়ে হয় মুক্তির স্বাদ পাচ্ছি, যে মুক্তির আকুলতা আমাদে[illegible] ভীষণ অসহায়

জন্মের লগ্নে। যে যন্ত্রণা নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, সহস্র বন্ধনের মধ্যে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত যার আহ্বান শুনছি অথচ সাড়া দিতে পারছি না, ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারছি না— সে ইচ্ছা সে চেষ্টাই কী এর মধ্যে দেখি আমরা? দেখে মুগ্ধ আচ্ছন্ন হয়ে যাই? তাই সবাই মিলে ভিড় করে এমন অবাক হয়ে চেয়ে আছি?

চিন্তা করতেই শিউরে উঠলাম আমি, উত্তেজনায় কাঁপতে থাকলাম। একটা বিরাট কিছু মহৎ কিছু লিখব বলে আমি অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম। সেই বিরাট সেই মহৎ আজ আমার সামনে আপনাকে উন্মোচিত করেছে। আমি অস্থির হয়ে উঠলাম, মনের মধ্যে চিৎকার করে বললাম, পেয়েছি পেয়েছি পেয়েছি। আমার আর মুহূর্ত বিলম্ব সইছিল না। আমি ঋতেনের মেসের দিকে হনহনিয়ে ছুটলাম। ঋতেনের কাছে যাব বলেই আমি রওনা হয়েছিলাম।

ঋতেন আমাকে দেখে অবাক।

'কিরে এ-ই সময়ে? তোর হোটেল কি বন্ধ নাকি আজ?'

'না।'

'তবে, চাকরি ছেড়ে দিয়েছিস?'

আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি নাকি আমাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে ঋতেনের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ঠিক মনে করতে পারলাম না।

আমি একটা চল্লিশ পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বেলে রেখে সারারাত জেগে থাকি, জেগে জেগে ছাইপাশ কী লিখি। অবশ্য আমার রাতজাগায় আমার বাবার জ্যাঠতুত ভাইয়ের কিছু এসে যায় না। অনেকখানি কারেণ্ট অযথা পোড়ে অবশ্য, তবু তাতেও নাকি তিনি কিছু মনে করেন না। কিন্তু অনেক রাত জাগলে খুব সকালে ওঠা যায় না এবং না উঠতে পারলে যে হোটেলের [illegible] হয় [illegible] তিনি বরদাস্ত করেন কি করে? অবশ্য অভি

শুধু একটাই নয়, আমি যে রোজ বাজার করি সেইটে নাকি খুব সস্তা না অথচ হোটেল রেস্টুরেনটের লাভই আসলে সস্তায় বাজার কেনাতে।

বলে কি মানুষটা? আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছি আমার বাবার জ্যাঠতুতু ভাইয়ের দিকে। বছর দেড়েক হল হোটেল দিয়েছেন, তার প্রথম দিকে মাস পাঁচ সাত বেধড়ক লোকসান খেয়েছেন, পরের মাস চার পাঁচও স্থবিধা করতে পারেননি কিছু, কোনমতে টায়েটুয়ে ডাইনে-বাঁয়ে সমান থেকেছে কেবল। অর্থাৎ এক বছরে একটি পয়সা যিনি ঘরে তুলতে পারেননি তাঁকে আমি এসে মাসে তিন শ' থেকে পাঁচ শ' টাকা নেট প্রফিট দিয়েছি। আমি ছ' মাস ধরে কাজ করছি এখানে। আমি ইনকাম-ট্যাক্সের হিসেব লিখতে জানিনে তাই হালে একজন সরকার রাখা হয়েছে। নয়ত একা আমিই ত এতদিন এত বড় হোটেল চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার বাবার জ্যাঠতুতু ভাই দিনে দু'বার কোঁচা দুলিয়ে হোটেল প্রদক্ষিণ করে যেতেন আর রাত এগারোটায় এসে ক্যাস মিলাতেন, হিসাব দেখতেন ঘণ্টাখানেক বসে।

আমার বিস্মিত চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, 'তাছাড়া ঠাকুর যখন নম্বর ধরে ধরে মাছ ডাল তরকারি ডালনার হিসাব বলে যায় তুমি সবটা ঠিক ঠিক লিখতেও পার না, বিশেষ বিশেষ নম্বরে কিছু কিছু বাদ পড়ে যায়।' একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা অথচ কত অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারল বেহায়া মানুষটা। গলার স্বর কাঁপল না, ঢোক গিলল না একটিবারও, এতটুকু বিকৃত হল না মুখের চামড়া। আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি তার দিকে। রাগে আমার ভিতরটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে টের পেয়েই যেন সামান্য হাসল মানুষটা, নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী যেমন হাসে। শেষে গম্ভীর হয়ে, কী ভীষণ অসহায়

এমন কণ্ঠে বলল, 'বলত, এমন হলে তোমাকে আমি রাখি কি করে ?'

অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর বেইমান মানুষটাকে দেখতে দেখতে, তার কথা শুনতে শুনতে, ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় আমার মনের জ্বালা কখন জুড়িয়ে গিয়েছিল জানতেও পারিনি ; এখন অনুভব করলাম, আমি একেবারে পাথর হয়ে গেছি আর ভীষণ ঠাণ্ডা।

সেই নির্বিকার ঠাণ্ডা গলায় উচ্চারণ করলাম, 'বেশ ত আমি চলে যাচ্ছি।'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

'না না আমি তোমাকে একেবারে ছাড়িয়ে দিতে চাইছি না, তাই বলে।' সত্যি কি অসহায় মনে হল লোকটার স্বর ? আমি গ্রাহ্য করলাম না।

'না আমি নিজেই ছেড়ে যাচ্ছি।' আমি পুনরায় শীতল গলায় উত্তর দিলাম।

আমি টেবিল থেকে দূরে সরে এলাম। আমার সামনে সেই খাতা-লেখা সরকার আর আমার বয়সী একটা নাদুস-নুদুস বোকা ছেলে। আমি সরকারের দিকে তাকালাম। আমার বাবার জ্যাঠতুতু ভাইয়ের ডাহা মিথ্যা ভাষণের বিরুদ্ধে আমি ভয়ানক ফেটে পড়ব, এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ওকেও জড়িয়ে ফেলব, একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠবে, ও পক্ষসমর্থনের জন্যে তৈরি হয়েছিল ; কিন্তু আমি কিছুই করলাম না দেখে ওর ধূর্ত চোখে এখন অবাক দৃষ্টি। আমি আমার বাবার জ্যাঠতুতু ভাইয়ের ভাগনা বুদ্ধু ছেলেটার দিকে আদৌ তাকালাম না। কেন জানি আমার মনে হয়েছে, আমাকে একেবারে ছাটাই করার ইচ্ছে আমার বাবার জ্যাঠতুতু ভাইয়ের নেই, এই ধূর্ত সরকারটিকে সামলানোর জন্যে একটি লোক দরকার। কিন্তু আমার ওপরও তাঁর পুরো বিশ্বাস নেই তাই বুদ্ধু ভাগনেটা থাকবে আমার ওপর খবরদারী করবার

জন্যে। আমি আর ম্যানেজার থাকব না। এ্যাসিসট্যান্টের পদে অবনতি ঘটবে আমার। এই অবনতি ঘটানোর জন্যেই এত মিথ্যাচার এত ষড়যন্ত্র। নিরুপায় মানুষকে মানুষ এমনি করেই অপমান অসম্মান করে। আমার ঘেন্না ধরে গেল। আমি চলে এলাম।

'শুধু হাতে ?'

'না ততখানি ছোট-আত্মা নয় মানুষটা। পনরদিনের মাইনে হাতে রেখে মাইনে দেবার রীতি নিউ অন্নপূর্ণা হোটেলের, ওটাকে সিকিউরিটিও মনে করতে পার। সেই একশ টাকা আর এদিকে একমাস দশদিন কাজ হয়েছিল তাকে পনরদিন ধরে তিনশ' টাকা।'

'ভাইপো বলে বুঝি তোকে পাঁচদিনের বেতন খয়রাৎ করল।'

'বোধ হয়।'

'যাক্, এখন কী করবি ঠিক করেছিস ?'

'লিখব।'

'লিখবি !'

'হ্যাঁ, উপন্যাস।'

বসেছিল ঋতেন, শুনে বালিশ তোষকের ডাঁইয়ের ওপর চিৎ হয়ে পড়ল। খানিক চিৎ হয়ে পড়ে থাকল ঋতেন। তারপর হঠাৎ শাল-প্রাংশু শরীর সোজা দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, 'স্নান কর, খা, একটা লম্বা ঘুম দে, মাথা ঠাণ্ডা হোক, আমিও অফিস থেকে আসি তখন কথা হবে।'

ঋতেন অফিসে চলে গেল আর ইতিমধ্যে আমি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে একটা সিঙ্গল সিটের রুম নিলাম। একশ' কুড়ি টাকায় খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে ফেললাম। হোটেল থেকে বইপত্র বিছানা এনে গুছিয়ে বসতেও দেরি করলাম না।।

তিন মাসের মধ্যে আমি আমার মহৎ চিন্তাকে উপন্যাসে

রূপ দিতে পারব এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস আমার রক্তে টগবগিয়ে ফুটছিল।

অফিস থেকে ফিরে এসে ঋতেন দেখে-শুনে হতভম্ব। খানিক গুম হয়ে থেকে বলল, 'ছ্যাখ বিমল, বিনি পয়সায় খেয়েছিস থেকেছিস আর বাজার চুরির পয়সায় টেরিলিনের শার্ট প্যাণ্ট স্যাময়স লেদারের জুতো পরেছিস'......

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'চুরির পয়সায় নয় দস্তুরির পয়সায় বল। প্রত্যেক দোকানদার হোটেলের বাজার সরকারকে দস্তুরি দেয়।'

'ওই হল, যে-ই কন্দ সেই কচু......তার পরেও মাসে দু'শ' টাকা পেয়ে তুই একটা পয়সা জমাতে পারিসনি। চারশ' টাকায় তুই তিনমাস চালাবি?'

ঋতেন দুমদাম পা ফেলে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু চলে যেতে পারল না, আবার ফিরে এল, তখনও ওর রাগ পড়েনি, বলল, 'ধর যদি তুই তিনমাসে একটা উপন্যাস শেষও করতে পারিস, 'ভাবিস, সে উপন্যাস পেয়ে বাংলা দেশ তোকে মাথায় করে রাখবে, খাওয়া-পরার ভাবনা ঘুচিয়ে দেবে? চাকরি করতে হবে না? আর চাকরি করতে চাইলেই, তুই চাকরি পাবি? তুই একটা গ্রাজুয়েট শুনেই তোকে ফ্যানের তলায় চেয়ার টেনে বসিয়ে দিয়ে বলবে, 'নাও চাকরি কর। পাঁচশ' টাকা মাইনে।'

'নিদেন একটা বেয়ারার চাকরি?' আমি ভয়ে ভয়ে বলি।

'তাই পাবে তুমি, তাই দেবে তোমাকে, সেদিকেই তুমি রওনা হয়েছ।' ঋতেন বলে।

এবং একটা গোঁয়ার গাড়লের মতন অসন্তুষ্ট পা ফেলে এবার বেরিয়ে যায় ঋতেন। পেছনের দিকে একবারও ফিরে তাকায় না।

আমি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বাতি জ্বালি। কাগজ টেনে লিখতে বসি আমি।

• রোজ লিখতে বসি, কিন্তু একটা অক্ষর এখনও লিখতে পারিনি। মুখ তুললে জানলার ফ্রেমে আঁটা একটা লেপা-মোছা আকাশ দেখি, আর মাথা নিচু করলে এক গাদা সাদা কাগজ। সেই বিরাট সেই মহৎ সহসা যেন কোথায় আত্মগোপন করেছে, নিহিত আবৃত করে রেখেছে নিজেকে। সহস্র চেষ্টায়ও তাকে অপাবৃত উন্মোচিত করতে পারছিনে আর, সে যেন আমার সব ক্ষমতার সব আয়ত্তের অন্তে চলে গেছে।

ভীষণ বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে বাইরে চলে যাই। এ শহরে আমার বন্ধুর সংখ্যা সামান্য, তারাও কেউ সরকারী অফিসে কেউ কমার্শিয়াল ফার্মে চাকরি করে, দেখা করতে চাইলে তাদের আস্তানায় যেতে হয়, তারা কেউ পথে পথে ঘোরে না। আমি নিঃসঙ্গ একা পথে পথে ঘুরি। চিনাবাদাম খাই, চানাচুর খাই, কখনও কখনও পথের ধারে দোকান-পাতা চা-অলা থেকে এক ভাঁড় চা নিই—হয়ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নিমেষে ভাঁড়টা নিঃশেষ করে ফেলি। কিংবা পথের পাশে পেতে-রাখা বেঞ্চিটায় বসি, একটু একটু করে চুমুক দেই ভাঁড়ে। তখন হঠাৎ যদি কোন চিন্তা মাথায় চিড়িক মেরে যায় ছুটতে ছুটতে মেসে চলে আসি। কোন দিকে না তাকিয়ে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে ঘরে চলে যাই, বসে পড়ি টেবিলের সামনে। কিন্তু কলম তুলে লিখতে গিয়েই বুঝতে পারি, যে-চিন্তাটা বিদ্যুতের মতন সহসা চমকে উঠেছিল মাথায়, সে তেমনি সহসাই মিলিয়ে গেছে, তার স্মৃতিটুকুও অবশিষ্ট নেই কোথাও। আকাশের দিকে তাকিয়ে রাত্রির নক্ষত্র দেখি। জানলার নিচে ট্রাম-লাইন বাসরুট, ব্যস্ত শহরের প্রচণ্ড কোলাহল ঘুলিয়ে

ওঠে আকাশে, চারদিকে ছড়ায়, তার মধ্যে অনেক দূরের রেলের সিটিও শুনতে পাই, বুঝতে পারি মনকে শৃংখলিত করতে পারছি না, সে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু কেন এমন হয়, হোটেলে ভোরবেলা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কাজ করে তারপরেও যদি সামান্য সময় পেয়েছি অসীম ক্লান্তি সত্ত্বেও কাগজ কলম নিয়ে বসতে পারলে দু'এক পাতা লেখা হয়েছে। অথচ এই কর্মহীন নিরুদ্বিগ্ন অবসরে কেন একটা লাইনও বেরুচ্ছে না! ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ হয়ে আমি রবীন্দ্রনাথ খুলে বসি, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাতা ওল্‌টাই। স্রোত যেমন মুহূর্তে তার আবর্তের মধ্যে মানুষকে টেনে নেয় তেমনি করে তাঁরা আমাকে তাঁদের বোধের মধ্যে তলিয়ে দিয়েছেন, অনুভব করেছি, এমন অসামান্য কিছু লিখতে ভীষণ মনোযোগ আর দুর্দান্ত মানসিক শৃংখলা দরকার। যে মনোযোগ ও শৃংখলার সেবায় ফুল ফোটে ফল ফলে আমি তা কিছুতে সংগ্রহ করে উঠতে পারছি নে। তাই আমার নিরঙ্কুশ অবসরের অনুর্বর মরুভূমিতে ফুল ফল দূরে থাক একটা কাঁটা গাছ একটা ধুতরোর কুঁড়ি পর্যন্ত কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আমার উৎকেন্দ্রিক মন অমনোযোগী হয়ে হাজার বাসনায় উড়ে বেড়াচ্ছে। অপচয় করছে মূল্যবান অবকাশের।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, মহৎ কোন শিল্পভাবনা ত নয়ই, কোন-আজেবাজে এলোমেলো চিন্তাও করছি না আমি। অসীম কৃপণের মতন আমি এখন খুঁটে খুঁটে আমার খরচের হিসেব কষছি। লিখতে পারছি না এই ক্ষোভে আত্ম-বিস্মৃত হতে ক'দিন সিনেমায় গেছি, ক'দিন থিয়েটারে, রাস্তায় রাস্তায় টহল মেরে কত চা চানাচুর চিনাবাদাম খেয়েছি, সিগারেট খেয়েছি।

তেল সাবান পেস্ট ধোবা বাদেই, শুধু খুচরো খরচই করে ফেলেছি পনর দিনে বাইশ টাকা। ভীষণ ভয়ে সিটিয়ে উঠলাম। ঋতেন বলেছিল, ছাখ বিমল, চারশ' টাকা এক টিপ

নস্যিও না! এক টিপ নস্যি যদি বা কোন মতে নাকের দু'গর্তে গলানো যায়, চারশ' টাকায় কোন মতেই দু'মাস চলে না।'

সত্যি বুঝি চলবে না। তাকে বুঝি চাকরিই করতে হবে। আবার দাসত্ব, আবার পরের ফরমাস খাটা। ঋতেন যা করছে। এ মেসের সব ক'টা লোক যা করছে। আসলে পৃথিবীতে একদল নিষ্ফল লোক থাকে যারা দাসত্ব করতেই ভালবাসে, দাসত্বের মধ্যেই ভাল থাকে। নিজের জীবনটা অন্যের সেবায় ব্যবহার করতেই তাদের জন্ম। নিজেকে সেবার জন্য যদি সে কখনও স্বাধীনতা লাভ করে ত সে স্বাধীনতা নীরস ধূসর অনুর্বর মরুভূমি হয়ে ওঠে, সেখানে না ফোটে একটা ফুল না ওড়ে একটা প্রজাপতি, ঊষর প্রান্তর শুধু পোকায় মাকড়ে ইঁদুরে ছুঁচোতে ভরে ওঠে, নোংরা আর আবর্জনার ডাঁই হয় কেবল। যারা এটা জানে তারাই প্রাজ্ঞ, অতএব পরার্থে জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করে না। আমিও কি তাই করব? একটা চাকরি নিয়ে বসব নাকি? এ ঊষর বালুকাস্তীর্ণ অবসরের প্রান্তর সামনে করে বসে থাকার চাইতে······কিন্তু সেই মুহূর্তে শিউরে উঠলাম—স্বাধীনতা যে কোন সময়ে বিকিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু ইচ্ছা করলেই তা আর সহজে অর্জন করা যায় না। যদি আমার পায়ের বেড়ি খুলেই পড়েছে, যদি আমি একবার মুক্তিই পেয়েছি ত সে মুক্তির নিরঙ্কুশ অবসরটুকু কেন চেখে চেখে ভোগ করব না, এ সুখটুকু যতখানি দীর্ঘ করা যায় কেন করব না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ঘরময় পায়চারি করছি, চোখের সামনে ভেসে উঠল বাড়ি ভাঙার দৃশ্য। কড়ি বর্গা শুদ্ধ ইট বালি চুন সুরকি ধসে পড়ছে, ধুলো উড়ছে, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে চারধার, মুক্তির বাতাস হাহা করে বইছে। চুন সুরকির গন্ধের সঙ্গে মিশে নাকে এল ঝাল-ঝোল-কালিয়া-ডালনা-ডাল-চচ্চড়ির গন্ধ। হোটেলের জীবন মনে পড়ছে। নিশ্চিন্ত আহার,

নিশ্চিন্ত আশ্রয় মাসান্তে মোটা টাকা—পরাধীনতার পরম সুখের ছবি। এ ছবি আমি নিজে কিছুতে ভেঙে দিতে পারতাম না। হাতুড়ি শাবল গাঁইতির গুঁতো না হলে যেমন ইট কাঠ কড়ি বর্গা শুদ্ধ ইমারত ধসে পড়ে না তেমনি পরাধীনতার বেড়িও না। স্বেচ্ছায় যে বেড়ি লোকে পরে, যত পীড়িতই হোক স্বেচ্ছায় আর সে সে-বেড়ি খুলতে পারে না। আমার বেড়ি যদি কেউ জোর করে খুলে নিল তবে সে বেড়ি সহজে আর আমি পরছি না। অন্তত স্বাধীনতার দিনগুলি যতখানি দীর্ঘ করা যায় করব। তার জন্যে খাওয়ার আরাম, শোয়ার আরাম, পোশাকের আরাম ছাড়ব। দিনান্তে দু'খানা রুটি আর তার সঙ্গে ফাউ যেটুকু তরকা পাব তাই খাব, মধ্যাহ্নে ছোলার ছাতু নুন জল দিয়ে ঠেসে কাঁই করে লঙ্কা কামড়ে কামড়ে খাব। স্বাধীনতা মানে কৃচ্ছ সাধনা। মানে নিজেকে যৎপরোনাস্তি সরলীকৃত করা।

খেতে যাবার আগেই ঠিক করে ফেললাম কাল সকাল থেকে বেলেঘাটা টু বেহালা চষতে সুরু করব। যেখানে হোক কোন বস্তির খুব সস্তা একটা ঘরে মাথা গোঁজার ঠাঁই চাই আগে। তারপর স্বাধীনতাকে ফলবান করবার কথা ভাবব।

এই সেই ঘর। আমার কঠিন পণের সাফল্য। দু'দিন উদয়াস্ত হাঁটাহাঁটির পর বেহালায় এসে পেয়ে গেলাম। প্রথমে গলির মুখের চা-অলাটা বিশ্বাসই করতে চায়নি। বলে, 'যান মশায়, এখানে থাকবেন কী, এখানে কী ভদ্রলোক থাকে!'

লোকটাকে বোঝালাম, 'বেকার মানুষ, হাতে যে ক'টা টাকা আছে আর একটা চাকরি পাওয়া তক সে টাকা ক'টায় কোন মতে ধড়ে প্রাণ রাখতে হবে। এখানে ছোটলোক ভদ্রলোকের প্রশ্ন নয়, বেঁচে থাকার প্রশ্ন।'

তারপরেও প্রশ্ন ছিল লোকটার, তারও উত্তর দিতে হল।

শেষে লোকটা আঙুল বাড়িয়ে যে ঘরটা দেখিয়ে দিল, এই সেই ঘর। একটা উঁচু মাটির ঘরের পেছন দিককার দেওয়াল থেকে একটা খোলার চালা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিন দিকে দাপনার বেড়া। ভিত কাঁচা। কিন্তু বেশ খটখটে শুকনো। তবে বড্ড ছোট ঘর। তিন হাত বাই চার হাত। একটি মাত্র জানলা। তাও একটা বড় ঘুলঘুলির থেকে বেশী বড় নয়। না হোক তাতেই আমি সন্তুষ্ট হলাম। এই যে পেয়েছি সেই পরম ভাগ্য মনে করতে আর খুঁতখুতনি থাকল না।

মেস থেকে বই বিছানা নিয়ে এলাম। কাছের একটা কাঠগোলা থেকে সরু একটা তক্তপোশও কিনে ফেললাম। গোছগাছ করে বসতে একটা দিন চলে গেল। পরের দিন থেকে আবার সাধনা সুরু করলাম। কিন্তু পার্থক্য কিছু ঘটল না। বউবাজারের দোতলার মেস থেকে বেহালার বস্তিতে খোলার ঘরে নেমে এলাম। খাওয়ায় পরায় থাকায় রীতিমত বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছি কিন্তু মাথার ভিতরের অবস্থাটা যথাপূর্বম্। সেখানে ভাবনাগুলি যেমন জ্যাম ধরে ছিল তেমনি শক্ত জমাট অন্ধকার হয়ে থাকল। কোন পথে একবিন্দু আলো সেখানে পৌঁছতে পারছে না।

কখনও স্যুটকেস টেনে এনে তার ওপরে কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে চিন্তা করি, কখনও টান হয়ে শুয়ে পড়ি বিছানায় —ছোট্ট জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যায়, তাল-নারকেলের মাথা দেখি, দু'চারটে পাখি উড়ে গেলেও জানতে পারি; কিন্তু যে মহৎ ও বৃহৎকে ধরতে চাই তাকে কোথাও পাইনে। আশ্চর্য! সত্তায় একেবারে সংলগ্ন থেকেও কী কৌশলে সে অধরাই থেকে যায়।

আমি একটু একটু করে টের পাই, সমস্যা কোথায়? আসলে আমাদের আবেগের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতাগুলি, জীবনের মৌল বোধই বলা যায় সেগুলিকে, কবজার মধ্যে আনা খুবই কঠিন। আমরা

সব সময়ই কতকগুলি শারীরবৃত্তিক দাবির চাপে অস্থির হয়ে থাকি, অন্যমনস্ক হয়ে যাই। আসল সমস্যার দিকে আর মনোযোগ দিতে পারি না। বুকে যথেষ্ট বাতাস টেনে নিতে না পারলে ফুসফুসে যে ধরনের কষ্ট হয় এ সমস্যাগুলি সে ধরনের কষ্টে আমাদের পীড়িত করে। আন্দাজ করতে পারি, রশ্মি-চিকিৎসার মতন মনোযোগকে সেই যন্ত্রণার বিন্দুতে নিবদ্ধ করতে পারলে আরোগ্য সম্ভব। কিন্তু মনটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতন। কেবলই দোলে, মুহূর্তের জন্যেও কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির হতে চায় না।

কিংবা বেড়ালকে ঘাড় ধরে শূন্যে তুলে ধরলে যে অবস্থা হয় —হাত পা ছোড়ে, দাঁত খিঁচোয়, প্রাণপণ চেষ্টা করে কিন্তু যে হাতখানা তার ঘাড় ধরে আছে কিছুতে তার নাগাল পায় না, আমাদেরও সে অবস্থা। যে সমস্যা আমাদের মুঠোর মধ্যে পুরে শূন্যে উঁচু করে রেখেছে, আমরা কিছুতে তাকে স্পর্শ করতে পারছি না। এই ত আমি, বিমলেন্দু বিশ্বাস, কোন মতে একটা শোয়ার জায়গা করে নিয়েছি, কোন মতে দু'বেলা খাচ্ছিও; রমণের প্রয়োজন হলে কোন মতে একটা মেয়েমানুষও জুটিয়ে নিতে পারব। কিন্তু আমার আবেগজাত যে অব্যাখ্যেয় যন্ত্রণায় আমি ভুগছি তার ত কোন সুরাহা হচ্ছে না। হবে না বলেই কি সব মানুষ রোজগার খাওয়া ও রমণের মধ্যে নিজেকে ভুলিয়ে রাখে, ভুলে থাকতে চায় যে, একটা অনায়ত্ত সমস্যা তাকে নিরবলম্ব শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছে, সে সমস্যার মুঠো থেকে তার নিষ্কৃতি নেই।

বই কলম কাগজ যেমন এলোমেলো ছিল পড়ে থেকেছে, আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম। তিন তিনটা দিন নিজেকে বন্দী করে রেখেছি ঘরে, পারতপক্ষে বেরোই নি, নিজের অক্ষমতার ও নিষ্ফলতার ওপরে নিদারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে শেষে আর থাকতে
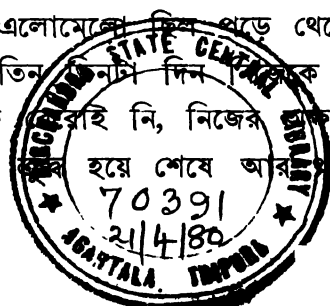
পারলাম না। কিন্তু ক্রমাগত অনুভব করেছি, আমি স্বাধীনভাবে চলতে পারছি না। আমি যেন পাখি নই, ঘুড়ি। হাঁটছি বটে এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তায়, ট্রাম থেকে বাসে যান বদলও করছি কিন্তু ভুলতে পারি না, কিছু আমাকে টানছে পেছনে, আমি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। যেন আমি এক সূক্ষ্ম সুতোয় বাঁধা। যেন আমার রুলটানা সাদা কাগজের সরু লাইনগুলি পর পর জুড়ে গিয়ে দীর্ঘ সুতো হয়েছে ; তার প্রান্ত আমার সত্তার একান্তে গ্রন্থি বাঁধা। এগুলেই সুতোয় টান লাগছে। অগত্যা একটু পরেই ফিরতে হল। কিন্তু নিজের ওপরে বিতৃষ্ণা এত প্রবল হয়েছে যে, তক্ষুনি সোজা ঘরে ঢুকতে পারলাম না, চায়ের দোকানে বেঞ্চিতে এসে বসলাম।

এ ক'দিন সকালে বিকেলে এসে দাঁড়িয়েছি, তু'খানা নেড়ি বিস্কুট তু'ভাঁড় চা খেয়েছি চলে গেছি। বসিনি বা একটাও কথা বলিনি। অতএব কত ভাড়ায় ঘরটা নিয়েছি, ঘরটা কেমন কিছুই চা-অলাকে বলা হয়নি এখনও। লোকটির অভিমান হয়েছে। স্বাভাবিক। সে যদি ঘরটার হদিস না দিত আমার নিজের চেষ্টায় ঘর পাওয়া কঠিন ছিল। তার অনুযোগ বিনীত-ভাবে মেনে নিলাম। লোকটি প্রসন্ন হল। এবং আমি যে চাকরির জন্যে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছি, তু'মিনিট বসতে তুটো কথা বলতে পাচ্ছিনে তা সে নিজেই বলল। আমি মাথা হেলিয়ে সায় দিলে সে আরও উৎসাহিত হল, আমার প্রতি সহানুভূতি আরও বেড়ে গেল তার। সেই সহানুভূতির মন নিয়ে সে যখন শুনল, পঁচিশ টাকায় ভাড়া নিয়েছি ঘর। তাও রান্না ঘর দেয়নি বুড়ি—আমি হোটেলে খাব শুনে, আগের ভাড়াটের জিনিস পত্র আছে এ অজুহাতে রান্নাঘরটা নিজের হেফাজতে রেখে দিয়েছে—লোকটি বাড়িঅলীর ওপরে ভীষণ চটে গেল।

'জানেন, 'রান্নাঘর সুদ্ধ ওই ঘরের ভাড়া মাত্র পনর টাকা

দিত আগের ভাড়াটে। আপনি কখনও রান্নাঘর ছাড়বেন না মশায়। ওটা বুড়ির পেজোমি। আগের ভাড়াটের জিনিসপত্র আছে না হাতি। গেলবারের বসন্ত মহামারীতে বউটি মরে গেলে সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। দরকারি জিনিসপত্র থাকলে লোকটি ফেলে গেছে নাকি! আপনি টান মেরে ফেলে দিন ত যা আছে। ঘরটা ব্যবহার করুন কিংবা পড়ে থাক কিন্তু দখল ছাড়বেন না। বুড়ি পাজীর পা ঝাড়া আর কাউকে ভাড়া দিয়ে দেবার মতলব ভাজছে। হয়ত কোন মদোমাতাল এসে ভাড়া নিয়ে বসবে। তখন ভীষণ মুশকিলে পড়বেন। হাঁ, বুড়ি যদি কিছু বলে, আমার নাম করবেন। পাঁচকড়ি পাত্রকে এ পাড়ার কেউ ঘাঁটায় না।

'ঠিক বলেছ ভাই, তাই নেব।'

চায়ের দাম দিয়ে উঠে পড়লাম আমি।

তারপরে আশেপাশেই খোলামেলা জায়গায় আরও কিছুক্ষণ পায়চারি করেছি। সন্ধ্যা হয়েছে। আকাশে তারা ফুটেছে। রাস্তায় আলো জ্বলেছে। ছেলে মেয়েরা পার্ক থেকে বাড়ি চলে গেছে, তখন শেষে রুটি তরকা খেয়ে এসে ঘরে ঢুকলাম। ততক্ষণে রান্না ঘর দখলের কথা আমার আর মনে নেই।

এমনই হয়, অক্ষমেরাই গোঁয়ার হয় সব থেকে বেশি। চিন্তাটাকে ধরতে পারছি না বলেই ধরবার এত জেদ। যেন একটা পুঁচকে মাছি। এই নাকে বসছে, এই ঠোঁটের ওপরে। ধরতে হাত বাড়ালেই উড়ে পালাচ্ছে কিন্তু বেশি দূরে না। মাথার চারধারে কানের কাছে ভন্‌ভন্‌ করছে। তক্ষুনি আবার এসে বসছে গালে কিংবা ঘাড়ে, বসেই হয়ত কুট করে কামড়ে দিলে। একেবারে দূর করে তাড়িয়েও দিতে পারছিনে আবার ধরতেও পারছিনে, আমাকে ছেড়ে ওটা চলেও যাবে না অথচ ধরাও

দেবেনা। একি বিষম জ্বালা! রাত যত বাড়ছে বিরক্তি অস্থিরতা তত বাড়ছে, তখনই হঠাৎ ছুটো ছুঁচো ঢুকল ঘরে, নূতন উৎপাত। ঘরময় ছুটোছুটি করছে আর কর্কশ কিচমিচ শব্দ করছে, তাড়া করলে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকছে, মুহূর্ত না যেতে আবার ফিরে আসছে।

তখনই মনে পড়ল পাঁচকড়ি পাত্রর কথা। আমার ব্যর্থতার সব ক্রোধ গিয়ে পড়ল ছুঁচো ছুটোর ওপরে, বুড়িটার ওপরে। হাঁ, আজই রান্নাঘর দখল করব। ওঘরে যাই থাক সব টান মেরে বাইরে ফেলে দেব। আমি কাল থেকে রান্না করে খাব। সস্তাও হবে স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

বাইরে থেকে রান্নাঘরের দরজায় বুড়ির তালা ঝুলছে বটে একটা কিন্তু আমার ঘর থেকে যে দরজা সে আমার হেফাজতে। আমি হুড়কো খুলে হারিকেন হাতে ঢুকে পড়লাম রান্নাঘরে। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে অন্ধকারের প্রাণীরা ছটফটিয়ে উঠল। যে যেদিকে পারছে ছুটছে। আমি আলো উঁচু করে ঘরটা দেখছিলাম। ঠিকই বলেছে পাঁচকড়ি পাত্র। ঘরটা আমার ঘরের থেকে বেশী ছোট না, অনায়াসে কোন মদোমাতালের আড্ডা হতে পারে। ঘরটা দখল করতে হবে।

কোনটা আগে ফেলি, আজই ফেলে দিই? এক ধারে একটা নোংরা উনুন, কালি পোড়া-কয়লা ছাইয়ে বোঝাই। তার আসে-পাশে ছড়ানো কয়েকটা কলাইওঠা বাসন-কোসন, একটা কাণা-ভাঙা কড়াই। রান্নার সরঞ্জাম বলতে এই। আর এক ধারে ছেঁড়া কাঁথা বালিশ ডাঁই করা। একটা ছেঁড়া মাদুর গুটোনো এক পাশে। সেখানে একটা ডালা-ভাঙা স্যুটকেশ আর একটা গাঁটরি। আরশোলাগুলি ওখানে জড়ো হয়ে আছে। আর সেই ছুঁচো ছুটো গাঁটরির তলা থেকে বারে বারে উঁকি মারছে আর পালাচ্ছে। বটে, তাহলে এই তোমাদের বাসা? অতএব সাফ যদি করতে হয় আগে তোমাদের আস্তানাই ভাঙব।

বুঝতে পারিনি, সুটকেশটার শুধু ডালা নয় তলাও ভাঙা। দু'হাতে ধরে উঁচু করেছি আর তলা খসে তার ভেতরকার সব জিনিস ছড়িয়ে পড়েছে মেঝেয়। জিনিস আর কিছু না, কতকগুলি আলগা কাগজ, কয়েকখানা খাতা, দু'খানা ডায়্যারি। সেগুলির কোণ ধার আরশোলা ও ইঁদুরের উদরে গেছে, মাঝখান থেকেও কিছু কিছু খুবলে খেয়েছে তারা।

সেগুলি গুছিয়ে পাজা করতে গিয়েই আমি আবিষ্কার করলাম শান্তনুকে। আবিষ্কার করলাম ঃ আমি বড় বোকা। সত্তার সঙ্গে সংলগ্ন এক দুর্বোধ্য বোধের আভাস মাত্র পেয়েছিল শান্তনু, অর্থও বোঝেনি। তারই টান কৈশোরে ঘর ছাড়া করেছে তাকে। সেই থেকে সে পথে পথে। বহুদিনে বহু দুঃখে বহু সাধ্যেও সে সে-বোধে পৌঁছতে পারেনি। হয়ত আজও সে সে-টানে পথে পথে ঘুরছে। আর আমি কিনা ঘরে বসে তেমনি এক বোধকে হাতের চেটোয় গাল রেখে বুদ্ধির জাল ফেলে ধরতে চেয়েছিলাম। না, আমার কথা থাক। শান্তনুর কথা বলি। কিন্তু আমি বলবার কে? আমি জানিই বা কী। তার কথা সে নিজেই বলেছে—আরশোলা ইঁদুরে উদরসাৎ-করা অংশ বাদ দিয়ে আমি তার সার সংকলন করেছি মাত্র।

[শান্তনুর ডায়্যারি সম্পাদনা করতে বসে আমি একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, আমার মতন নিস্ফল মানুষ যেমন বহু আছে, তেমনি এমন অনেক মানুষ আছে যাদের জীবন নিখুঁত নাটকীয়তায় গড়া। যেন কোন নিপুণ নাট্যকারের লেখা একখানা মঞ্চ-সফল নাটক। তাদের জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনাপঞ্জী সূক্ষ্ম যুক্তির এমন এক স্তরে বিধৃত যে, বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে কিছুতেই তা মেলানো যায় না। আসলে তারা প্রতিদিনকার এই বিস্বাদ বিবর্ণ পৃথিবীরই মানুষ নয়। তারা যে আমাদের মধ্যে জন্মেও আমাদের মতন নয়, তার কারণ তাই বলে এই নয় যে, বাইরের কোন সংঘাতে সংঘর্ষে তারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন পৃথক হয়ে গেছে, নিজেকে পৃথিবীতে বিদেশী মনে করছে। আসলে মানুষের মধ্যে কখনো কখনো এমন একটা বোধ কাজ করতে থাকে যাতে করে সে কিছুতেই আর নিজেকে পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত সংলগ্ন অনুভব করতে পারে না। শান্তনুও পারেনি।]

১

শান্তনু এভাবে তার ডায়্যারি লিখতে সুরু করেছে ঃ

আমাদের বাড়িতে অনেক মানুষ ছিল। আত্মীয়-অতিথি-অনাথ ও ঝি-চাকর-মজুরে আমাদের বাড়িটা সর্বদা গিস্‌গিস্ করত, ঝম্‌ঝম্ করত। বাড়িতে আমার বয়সী অনেক ছেলেমেয়েও ছিল। আমি সকলের সঙ্গে একসাথে মানুষ হয়েছি। আমাকে পৃথকভাবে, পৃথক করে আদর যত্ন করবার কেউ ছিল না। কেননা আমার মা ছিল না। আমার মা যে কবে মারা গিয়েছিল আমি জানতাম না। আমার মাকে আমি কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমার তনুদেহ দীর্ঘাঙ্গী মা খুব সুন্দরী ছিলেন। আমি তাঁর ফোটো দেখেছি। বাবার শোবার ঘরে তাঁর ফোটো ঝুলোনো থাকত। পরে আমার যখন পৃথক ঘর হয়েছে তার দেওয়ালে আমার মায়ের সে ফোটো শোভা পেত। বোধ হয় নূতন মা-ই ফোটোখানা আমার ঘরে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। আমার নূতন মা আমার মাকে সহ্য করতে পারত না।

আমার মায়ের সম্পর্কে আমি অনেক কথা শুনেছি, যে যখন সুযোগ পেত আমাকে শোনাত। কেউ নিন্দা করত কেউ প্রশংসা করত। তার থেকে আমি জেনেছি, আমার মায়ের অনেক গুণ ছিল। তিনি পড়তে জানতেন, গাইতে পারতেন। তাঁর নাচ-গানের খুব খ্যাতি ছিল। আসলে তিনি একজন নর্তকী ছিলেন। রঙ্গমঞ্চেও অভিনয় করতেন। আমার মায়ের চরিত্র নাকি নষ্ট ছিল। অনেকে তাকে ভ্রষ্টা বলে গাল দিত। কেউ কেউ বলত, আমার মায়ের নাকি সন্তান-পালন ঘর-সংসার ভাল লাগত না। তাই একদিন

তিনি নিঃশব্দে চলে গেছেন। আর ফিরে আসেন নি। কিন্তু আমি জানি, আমার বিশ্বাস, মা নেই, আমার মা মরে গেছেন। মরে না গেলে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখি কেন? আমার নূতন মা জীবিত, আমার বাবা জীবিত, আমার আন্নামা, বাড়ীর ছেলে-বুড়ো, জীবিত সব মানুষ, কেউ ত আমার স্বপ্নে এসে হাজির হয় না। আমি তাদের স্বপ্নে দেখি না কেন? না, আমার বিশ্বাস, জীবন্ত মানুষ স্বপ্নে আসতে পারে না। সে-বয়সে আমার বিশ্বাস ছিল স্বর্গের মানুষ ছাড়া স্বপ্নে প্রবেশ করবার কারোর অধিকার নেই। হাঁ, আমি বিশ্বাস করি, আমার মা স্বর্গে আছেন। স্বর্গে যেসব মেয়েরা থাকে তারা পরীর মতন। তাদের পিঠে পাখির মতন ডানা থাকে। আমার মায়েরও ডানা দেখেছি। ডানা মেলে ধীরে ধীরে আমার মা পাখির মতন হাওয়ায় ভেসে আমার স্বপ্নে নেমে আসতেন। আমি মাকে দেখেই দু'হাত মেলে তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। দু'হাতে তাঁর বুক জড়িয়ে ধরতাম, দু'পায়ে তাঁর কোমর। আমি তাঁর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে দিতাম আর সে অবস্থায় মা আমাকে নিয়ে আকাশে উঠে যেতেন। অনেক দূর আকাশে আমরা উড়ে যেতাম। চতুর্দিকে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকত ও অনেক দূরে ডিমের কুসুমের মতন লাল, সেই রকম গোল সূর্য দেখতে পেতাম। আমার বড় ইচ্ছে যেত, মা আমাকে সূর্যের কাছে নিয়ে যাক, আমরা দু'জনে সূর্যের শরীরে মিশে যাই। কিন্তু অতদূরে যেতে মায়ের যদি কষ্ট হয়, আমি তাই একটু পরেই বলতাম, 'মা আর কাজ নেই উড়ে; আমাকে বুকে করে উড়তে তোমার কষ্ট হচ্ছে।' মা তখন নেমে আসতেন। আস্তে করে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, আমার গালে ছোট্ট একটি চুমু খেয়ে চলে যেতেন। যেদিন আমি মাকে স্বপ্নে দেখতাম সেদিনটি আমার বড় সুখে কাটত।

আমার মা ছিল না বলে আমার কোন দুঃখ ছিল না। কেননা মা না থাকলে কী ধরনের দুঃখ হয়, দুঃখ পায় লোকে আমি জানতাম

না। আমাদের বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েরা তাদের মায়েদের কাছে যেমন আদর পেত তেমন আদর আমিও পেয়েছি। না, আমার যে মাসি বাবার স্ত্রী হয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছিল তার কাছে নয়। সে আমাকে আদর করত না। বিয়ের আগে মাঝে মাঝে মাসি আমাদের বাড়িতে আসত, থাকত। তখন সে আমাকে আদর করেছে। কোলে নিয়েছে, চুমু খেয়েছে, নাড়ু মোয়া দিয়েছে। বাবার স্ত্রী হয়ে আসার পরে সে আর তা করত না। আমিও চাইনি। আমি তার কাছে যেতাম না। ডাকলেও না। আমি তাকে ঘৃণা করতাম। আমার মায়ের বোন হলে কি হবে সে আদৌ আমার মায়ের মতন দেখতে ছিল না। সে মোটা ছিল, কালো ছিল। তার ঠোঁট পুরু আর গাল দুটো ফুলোফুলো ছিল। চোখ দুটো বড় বড়, আর কপাল ছোট ছিল। অবশ্য বড় এক গোছা চুল ছিল। তবু হয়ত আমি তাকে ঘৃণা করতাম না। কিন্তু বাবা যখন ডেকে বললেন, 'এ তোর মা. একে মা বলে ডাকবি।' নূতন মায়ের দিকে তাকিয়ে আমি অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করেছি। যে আদৌ আমার মায়ের মতন নয়, তাকে আমি মা বলে কেন ডাকব আমি বুঝতে পারতাম না। আমি তাকে কোনদিন মা বলে ডাকিনি। বরং আমাদের রাঁধুনীকে মা ডাকতে আমার বড় ভাল লাগত। সেও সুন্দরী ছিল না। বেশ মোটা আর খাটো ছিল কিন্তু তার মুখে চোখে কপালে শ্রী ছিল। তাছাড়া আমি তার মধ্যে মায়ের স্নেহ অনুভব করেছি।

আমাদের রাঁধুনীর নাম ছিল অন্নপূর্ণা। সবাই তাকে অন্ন বলে ডাকত। কিন্তু সে ছিল আমার একলার আন্নামা। সে আমাকে কোলে নিত আদর করত। বস্তুত আমি তার কোলে-পিঠে মানুষ। তার খুব স্থূল দুটো স্তন ছিল। আমি তার কোলে উঠে একটি স্তন মুখে দিয়ে চুষতাম আর একটি নোখ দিয়ে আস্তে আস্তে খুঁটতাম। আন্নামা আমাকে সাপটে ধরে রাখত। কখনো কখনো তার নাক থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ত। তাকে বলতে শুনতাম, 'আহা, মা মরা

ছেলে।' তাতে আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছিল যে, আমার মা নেই, মা মরে গেছে। আমি রাতে আন্নামার কাছেই ঘুমোতাম। বাবা আমার মাসিকে বিয়ে করবার পরেও অনেকদিন শুয়েছি। হঠাৎ একদিন মাসি আমাকে ডেকে পাঠাল, বলল, 'তুমি এখন পাঠশালা ছেড়ে বড় স্কুলে এসেছ, তুমি এখন বড় হয়েছ। তুমি আজ থেকে আর অন্নর কাছে শোবে না। তুমি আজ থেকে পুবের কোণের ঘরে একা শোবে। ওটা তোমার পড়ার ঘর, শোবার ঘর। ওটা তোমার নিজের একলার ঘর। আমি তোমার ঘর গুছিয়ে দিয়েছি।'

আমার ঘর। আমি আর সকল থেকে আলাদা, স্বকীয় একক। এই প্রথম আমি আমার নিজস্ব অস্তিত্বের স্বীকৃতি পেলাম। আমি এতদিন সকলের একজন হয়ে সকলের মধ্যে হারিয়ে ছিলাম। আজ আমাকে সকলের থেকে আলাদা করে দেখতে পেয়েছে বাড়ির মানুষ। মুহূর্তের মধ্যে অহংকারে আমার বুক ভরে উঠল। ছুটে গিয়ে আমার ঘরে ঢুকলাম। টেবিল চেয়ার আলনা আলমারি খাট ছবি ক্যালেণ্ডার, পর্যন্ত মায়ের ফোটোখানা। নূতন চুনকামকরা ঘর দিনের আলোয় ঝক্‌ঝক্‌ করছিল। একা দেখে সুখ পাচ্ছিলাম না। আমার বয়সী সবাইকে ডেকে আনলাম। তাদের নিজস্ব একলার ঘর কারো নেই।

'জানিস শানুর, যা দেখছিস সব—সব শানুর!'

'একলা তোর?'

তারা আমার টেবিল খাট আলমারি আলনা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে লাগল। বলাবলি করতে লাগল। কেউ কেউ খাটেও উঠে পড়ল।

'কত বড় খাট। কী নরম!'

আমি কাউকে বারণ করছিলাম না। দেখুক। বলুক। ওদের কথা শুনে ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সম্রাট মনে হচ্ছিল।

নূতন মায়ের কথাটা আমার কানে গুনগুনিয়ে বাজছিল, 'তুমি এখন পাঠশালা ছেড়ে বড় স্কুলে এসেছ, তুমি এখন বড় হয়েছ।' আমি এখন বড় হয়েছি, বাবার মতন বড়। আমার বয়সীদের ছাড়িয়ে আমার মাথা যেন অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। অনেক উঁচু থেকে আমি ওদের করুণার চোখে দেখছিলাম।

কিন্তু দিনের আলো যতই নিভে আসতে লাগল আমার অহংকারে উন্নত মাথাটা ততই নুয়ে পড়তে থাকল, অহংকারে ফুলে-ওঠা বুকটা ততই চুপসে যেতে থাকল।

সন্ধ্যা হলে আর আমি থাকতে পারলাম না। নূতন হারিকেনের উজ্জ্বল আলো টেবিলের ওপরে। কিন্তু তাতে ঘরের সব অন্ধকার দূর হয়নি বরং আলোর আক্রমণে ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ অন্ধকারগুলি যেন নানা হিংস্র জানোয়ারের মুখোস পরে টেবিলের তলায় খাটের নিচে আলনার পেছনে সিলিংএর কোণে কোণে ওৎ পেতে আমাকে দেখছিল। যেন শাসাচ্ছিল আমাকে। যেন যে-কোন সময় সুযোগ পেলে আমার ঘাড় মটকে খাবে। আমি ছুটে এলাম রান্নাঘরে। গোঁয়ারের মতন আন্নামার আঁচল ধরে গোঁজ হয়ে রইলাম।

'আমি ও-ঘরে একলা শুতে পারব না, আমি তোমার কাছে শোব।'

'তোমার মা'র তা ইচ্ছে নয়। তুমি বড় হয়েছ, তুমি বড় স্কুলে পড়ছ। এখন তুমি একটা ঘরে একলা শোবে।'

'আমার ভয় করে।'

দু' একদিন ভয় করবে তারপর অভ্যাস হয়ে যাবে।'

'না আমি কিছুতেই একলা শুতে পারব না। আমি শোব না, শোব না, শোব না।'

আন্নামা তখন আমাকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিল। আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'বেশ, আমি যাব, তোমার নূতন মা শুয়ে পড়লে, সব্বাইর খাওয়া হয়ে গেলে, তখন।

ততক্ষণ কিন্তু তুমি পড়াশোনা করবে কাউকে বুঝতে দেবে না, তুমি একলা ঘরে ভয় পাচ্ছ, তুমি একলা শুতে চাইছ না।'

'ঠিক বলছ, আসবে?'

আন্নামা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। অনেক রাতে নিঃশব্দে সে ভেজান দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে, আধমরা মতন, হারিকেনের সামনে বসেছিলাম। তাকে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

এতদিন রান্নাঘরের পাশে সরু তক্তপোশে শক্ত বিছানায় দু'জনে শুয়েছি। শিয়রে ছোট একটা জানালা ছিল, খুব ঝড়, ঝড়ো হাওয়া না বইলে বোঝা যেত না, সে পথে বাতাস আসছে। শীতের দিনে কষ্ট ছিল না; কিন্তু বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের রাতে দু'জনে ঘেমে নেয়ে একশেষ হতাম।

আজ কি বাতাস! এখন গ্রীষ্মের দিন। পুবে দক্ষিণে দুটো বড় জানলা সম্পূর্ণ খোলা। হু-হু করে হাওয়া আসছে। তিন চারজনে শুতে পারি এতবড় খাট, মোটা গদির ওপরে নরম বিছানা। আহ্ কী আরাম! চুপি চুপি বললাম, 'আন্নামা, আজ আমরা খুব আরামে ঘুমোব।'

আন্নামা মোটা মানুষ তায় গরম-কাতুরে। আবার শুচিবাইও আছে। এঁটোঘাঁটা কাপড়ে বিছানায় ওঠে না। শীতের দিনে লেপের তলায় শোয়, তখন তার গায়ে একটা সেমিজ থাকে, গরমের দিনে তাও না। কাপড় সেমিজ শিয়রে খুলে রেখে শুয়ে পড়ে। অবশ্য সে আসার অনেক আগে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। সে যখন আসত তখন আমার গভীর ঘুম। কিন্তু তার জন্যে আমার মনের মধ্যে একটা আকুল প্রতীক্ষা থাকত বলে সে বিছানায় গা দিলেই আমি যেন টের পেতাম। এবং সেই গভীর ঘুমের মধ্যেই আমি তার দুই উরুর মধ্যে একটা পা গলিয়ে দিতাম। তার দুই স্থূল স্তনের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে তার শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে না পারলে আমি নিশ্চিন্ত হতাম না।

জ্ঞান হওয়ার বয়স থেকে এই যার শোয়ার অভ্যাস তাকে হুকুম করা হয়েছে একলা শুতে। আমি ফিস্‌ফিস্‌ করে বললাম, 'আন্নামা, তুমি রোজ আমার সঙ্গে শুতে আসবে। যদি না আস, যেদিন আসবে না, আমি দিঘির পাড়ের হিজল গাছে গলায় দড়ি দেব।'

আন্নামা খুক্‌ করে একটু হেসে বলল, 'যে মানুষ একলা ঘরে আলোর সামনে বসেই ভয়ের চোটে ফুলে ঢোল হয়ে থাকে সে যাবে সেই দিঘির পাড়, সেই হিজল গাছের তলায়, যেখানে এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভূত পেতনীরা জটলা করে, আড্ডা মারে।'

'তবে দিনের বেলা দিঘির জলে মরব।'

এবারও আন্নামা চুপ গলায় হেসে উঠল, 'কি করে ডুববে? তুমি ত খুব ভাল সাঁতার জান।'

তাই ত, তবে? আমি চিন্তা করি। একটু চিন্তা করতেই মনে পড়ল।

আমার যে দিদির বছর তিন হল বিয়ে হয়েছে তার থেকে সামান্য বড় হবে, আমাদের এক ঝি ছিল। নাম সর্বাণী। কী এক রোগে তার তলপেট ফুলে উঠেছিল। পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে একদিন সর্বাণী ধুতরো আর করবী বীজ একসঙ্গে বেটে খেয়েছিল। তাইতেই সে মরে গেছে। ওই ফুল দুটোর বীজ নাকি ভীষণ বিষ, আন্নামা আমাকে বলেছিল। অনেক রাত্রিতে সর্বাণী যেদিন মারা গেল বাড়িময় সেকি ফিস্‌ফিস্‌ গুজগুজ—থমথমে ভাব। বাবা খুব গম্ভীর এবং সকলের ওপরে খুব ক্রুদ্ধ মনে হয়েছিল। আমি আন্নামার আঁচল ধরে অনেক দূরে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার চোখভরা ঘুম তবুও আমি চোখ বুজতে পারছিলাম না। আমার ভীষণ ভয় করছিল। আমি পরে আন্নামাকে বলেছিলাম, 'দেখো তোমার যেন কখনো পেট ফুলে ওঠে না। খুব সাবধান, যদি কখনো তেমন বোঝ আমাকে বলবে, আমি সরকারী ডিসপেনসারী থেকে খুব ভাল ওষুধ এনে দেব। দেখবে, কিছু যন্ত্রণা হবে না। অসুখ ভাল হয়ে যাবে।'

আন্নামা হেসে আমাকে বুকে চেপে বলেছিল, ‘মুখ পোড়া শয়তান আসুক দেখি কাছে ? যার পাহারাদার নেই, যে যুবতী একলা ঘরে শোয় তারই শরীরে এমন শয়তান ভর করে। তারই এমন সর্বনেশে রোগ হয়। তুমি আমার পাহারাদার থাকতে আমার এ রোগ হবে কেন ? শয়তান কাছে ঘেঁষতে সাহস পাবে কেন ?

সেই করবী আর ধুতরোর বীজ মনে পড়তেই বললাম, ‘আমি বিষ খাব তবে।’

‘বালাই ষাট ! অমন অলক্ষুনে কথা বল না শানু, তুমি এখন ঘুমোও।’

‘তুমি কখনো আমায় ছেড়ে যাবে না বল ?’

আন্নামা কোন জবাব দিল না। কেবল একটা বড় নিঃশ্বাসের শব্দ করল আন্নামা। সে আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলোচ্ছিল।

আন্নামা প্রতিশ্রুতি দিল না ; কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সে কখনো আমাকে ছেড়ে যাবে না। আমি পরম নিশ্চিন্তে আন্নামাকে জড়িয়ে ধরে চোখ বুজলাম। কিন্তু তক্ষুনি ঘুম আসছিল না।

আগেই বলেছি, আমার ঘুম আসবার আগে কোনদিন আন্নামা আমার কাছে শুতে আসত না। সবাইকে খাইয়ে নিজে খেয়ে এঁটো বাসন-কোসন ঝি চাকরের হাতে সমঝে দিয়ে তবে তার ছুটি। রাত তখন কখনো কখনো বারটা বেজে যেত। আমি আন্নামার বিছানায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিংবা মায়ের সঙ্গে আকাশে ওড়বার স্বপ্ন দেখছি। আন্নামা তখন এসেছে। ঘুম থেকে তুলে আমাকে পেচ্ছাব করিয়েছে। হাফ-প্যান্টটা পরা থাকলে ছাড়িয়ে ফেলেছে। নিজে সে সেমিজ কাপড় ছেড়ে রেখে আমাকে নিয়ে শুয়েছে। রাজ্যের ঘুম তখন আমার চোখে। আমি তখন চোখ মেলতে পারতাম না। চোখ মেলেও কিছু দেখতে পেতাম না।

আজ কিন্তু তেমন নয়। আজ আমি জেগে আছি। সব দেখতে পাচ্ছি। এবং বুঝতে পারছি আজ আমার সহজে ঘুম আসবে না। আজ আমার বুক ভরে সুখের সীমা নেই। আজ আমি হঠাৎ বড় হয়ে গেছি। নূতন মা বলেছে, আমি বড় হয়েছি। আন্নামা বলেছে, আমি বড় হয়েছি। আমি নিজেও বুঝেছি, আমি বড় হয়েছি। কেননা, আজ যাকেই ডেকে এনে আমার ঘর দেখিয়েছি সেই আমার দিকে এমন করে তাকিয়েছে যেন আমি হঠাৎ খুব বড় হয়ে গেছি। আমার মনের মধ্যে সেই অহংকারের সুখ। সর্বোপরি আন্নামায়ের প্রতিশ্রুতি, সে আমার কাছে শোবে। এত সুখ মনে থাকলে ঘুম আসে কখনো! আমার ঘুম আসছিল না। জেগে থেকে আন্নামার কোলে এমন করে কখনো শুইনি আমি, সেই সুখেও আমার শরীর অস্থির-অস্থির করছিল। আন্নামার গা থেকে একটা টক-টক মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ আসছিল। আমার ভাল লাগছিল। আমি আন্নামার ত্বকে জিভ ছোঁয়ালাম। একটা চমৎকার লোনা স্বাদে মুখ ভরে গেল।

আন্নামা গাল টিপে দিল, 'বুড়োধাড়ী ছেলে গা চাটে।'

'চাটব ত।'

আমি এবার একটা স্তন মুখে পুরে দিলাম এবং তার উরু টেনে এনে তার শরীরের সঙ্গে আরও বেশি করে ঘনিষ্ঠ হলাম। হঠাৎ খসখসে কিছু আমার শরীরে ঘষা লাগতে আমি হাত দিয়ে একগুচ্ছ চুল টের পাই।

'আন্নামা, এগুলি কি?'

'চুল।'

'এখানে চুল কেন?'

'জানিনে কেন হয়, তোমারও হবে।'

'কবে?'

'আর একটু বড় হলে।'

'আন্নামা আমার মতন তোমার নেই কেন ?'

'আমি মেয়েমানুষ বলে, আমার যা আছে, তোমার নেই।'

'মেয়েদের বুকে মাই থাকে কেন ?'

'তারা মা হবে বলে।'

'মেয়েরা কি করে মা হয় ?'

'একদিন বলব।'

'আজ বল।'

'না, আর একটু বড় হও।'

'তুমি না বললে, আমি বড় হয়েছি।'

'আরও একটু বড় হলে বলব।'

জীবন সম্পর্কে এত বড় কৌতূহলের কথাটা তার কাছ থেকে আমার আর জানা হল না। তার আগেই দুর্ঘটনা ঘটল।

আমার ঘরের দুটো দরজা। একটা দরজা পাশের ঘরে যাতায়াতের। সে ঘরে কিছু অকেজো আসবাবপত্র আছে। তাই দরজাটা অপ্রয়োজনীয় বলে ছিটকিনি এঁটে দিয়ে তার গায়ে আমার আলনা সাজানো হয়েছে। সে দরজা আমি দেখেছি। আন্নামা দেখেছে। আমরা রোজ দেখি। কেন দেখব না ? ও ত আমাদের চোখের ওপরই সব সময়। তার ছিটকিনি আঁটাই আছে কি কেউ খুলে রেখে গেছে নিত্য শোবার আগে তা পরীক্ষা করে দেখবার অভ্যাস আমাদের ছিল না। কেননা, আমাদের মনে পাপ ছিল না।

নিত্যকার মতন সেদিনও আমি আন্নামার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে যথারীতি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জানি না কখন চোখের ওপরে এক উজ্জ্বল আলো অনুভব করলাম। সে আলোয় চোখ মেলে দেখতে পেলাম, আন্নামার শরীর ক্রমশ বদলে যাচ্ছে মায়ের রূপে। দেখতে দেখতে তার স্থূল দেহ তনু হল, দীর্ঘ হল। মোমের মতন

নরম আর জ্যোৎস্নার মতন অলৌকিক হল। শেষে তার দু'হাতের পেছনে দুটো ডানা গজাল। আন্নামা মায়ের শরীর পেয়ে খুব হাল্‌কা হয়ে গেল। আমি যেভাবে তাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম সেভাবেই আছি, আমাকে নিয়ে সে উড়াল দিল। অনন্ত শূন্যের দিকে আমরা উড়ে চললাম। সেই ডিমের কুসুম মতন লাল সূর্যের দিকে। আজ যেন আমরা স্থির করেছি ওই সূর্যের দেহে মিশে যাব। আমরা আর ফিরে আসব না। সূর্য ক্রমশ বৃহৎ উজ্জ্বল ও জবাকুসুম রক্তবর্ণ হচ্ছিল। তাপ বাড়ছিল। সে তাপ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার ভয় করছিল। ভয়ে আমার হাত পা শিথিল হয়ে আসছিল। এক সময়ে আমি আমার অজানতেই মায়ের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। মা প্রচণ্ড গতিতে উড়ে গিয়ে সূর্য-দেহে মিশে গেল। আর আমি উল্কা বেগে নেমে আসতে থাকলাম। আমি একটা কঠিন পাথরে আছড়ে পড়তেই ভীষণ ভয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি চমকে উঠে বসলাম। চেয়ে দেখি টেবিলের ওপরে হারিকেন দপদপ করে জ্বলছে। আন্নামা বিছানায় নেই। সামনে নূতন মা দাঁড়িয়ে। যেন করালী কালী মূর্তি। ক্ষণে ক্ষণে নাসারন্ধ্র ফুলছে আর ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। উষ্কখুষ্ক চুল, এলোমেলো সাড়ি। মুখের কঠিন রেখাগুলি সংকুচিত প্রসারিত হচ্ছিল। কাঁপছিল নূতন মা। দাঁতে দাঁত ঘষছিল। কড়কড় শব্দ হচ্ছিল। নূতন মা যে দেখতে এত কুৎসিত এমন বিশ্রী তা যেন আর কোনদিন চোখে পড়েনি। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। হারিকেনটা দেখছিলাম। ওটা বাবার ঘরের বাতি। বুঝলাম, ওটা নূতন মা হাতে করে নিয়ে এসেছে।

আন্নামা মুখ ঢেকে খাটের বাজুর ওপরে উপুড় হয়ে ছিল।

নূতন মা তাকে লাথি মেরে বলল, 'বদমাস মাগী, কাল ভোরে যেন আমি তোর মুখ দেখিনে।'

চোখ কটমট করে সে আমার দিকেও এগিয়ে এসেছিল। ভাবলাম, বুঝি আমাকেও মারবে। কিন্তু না, সে শুধু তীব্র দৃষ্টিতে আমাকে একটুকাল দেখল। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'হবে না, নষ্ট-চরিত্র মায়ের ছেলে নষ্ট-চরিত্র হবে না ত হবে কী!'

হারিকেনটা হাতে করে নূতন মা সেই আলনার পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ক্ষণকাল ঘন অন্ধকারে ডুবে রইলাম। অল্পে অল্পে সে জমাট অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছিল। ঘরের বড় বড় দুটো জানলা দিয়ে নক্ষত্রের আলো এসে ঘরের অন্ধকার হাল্কা করে দিচ্ছিল। সে জলোজলো অন্ধকারে দেখলাম, আন্নামা সেমিজ কাপড় পরছে। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। আমি শক্ত হয়ে বসেছিলাম। সে নিকটে এসে আমাকে জোর করে শুইয়ে দিল। আমাকে চুমু খেল। তার চোখের জলে আমার গাল কপাল ঠোঁট ভিজে গেল। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষণকাল আমার মাথায় হাত বুলোলো। তারপর দেখলাম, আস্তে আস্তে সে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। শেষে ছিটকিনি খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল আন্নামা।

আশ্চর্য! আন্নামা বেরিয়ে গেল। আমি শূন্য ঘরে একা। তবু আমার এতটুকু ভয় করেনি। আমি অবশিষ্ট রাত জেগেছিলাম কি ঘুমিয়েছি জানি না। আমি ক্রোধে ঘৃণায় বিছানায় শক্ত কাঠ হয়ে পড়েছিলাম।

আমি যখন উঠে বাইরে এলাম, সূর্য তখন গাছের মাথায় উঠে গেছে আর সমস্ত বাড়িটা নিত্যকার মতন হাজার কাজের তাড়ায় ঝমঝম করছে। জানি বৃথা, জানি মধ্যরাতেই সে চলে গেছে। তবু আমি আন্নামার খোঁজে রান্নাঘরে এলাম। পেলাম না। আমার আন্নামাকে আর কোনদিন পাব না। সে আর

কোনদিন ফিরে আসবে না। আমি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। আমি আন্নামার তক্তপোশের ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে রইলাম। কান্না থামলে আমি চোখ মুছে বাইরে এলাম। উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি। অসহায় চোখ তুলে তাকাচ্ছি সবায়ের দিকে। যে যার কাজে ছুটোছুটি করছে কিংবা হেসেখেলে বেড়াচ্ছে। আমার দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। আমাকে কেউ দেখছে না। আমার যে ভীষণ দুঃখ, আমি যে ভীষণ বিষণ্ণ তা যেন কেউ বুঝছে না বা গ্রাহ্য করছে না। আমি যে কেন একলা দাঁড়িয়ে আছি তাও কেউ জানতে চাইছে না। আমি যেন এ বাড়ির কেউ না। আমি যেন এখানে একজন বিদেশী দাঁড়িয়ে আছি। আশ্চর্য! একটা লোক যে চলে গেল। আর যে সে কোনদিন আসবে না এর জন্যে কারো মুখে একবিন্দু কষ্ট চোখে পড়ছে না। কেউ যেন জানেই না অথবা জানে কিন্তু তুচ্ছ করছে যেন ওটা কোন ঘটনাই নয়। জলে ঢিল পড়লে সে যেমন নিঃশেষে মিলিয়ে যায় আন্নামা এ বাড়ি থেকে যেন তেমনি করেই মিলিয়ে গেল। কোথাও একবিন্দু দাগ রইল না, কোথাও এতটুকু ফাঁক না। আমি ছুটে চলে এলাম আমার ঘরে।

সেই থেকে আমি যেন বাড়িটাতে বিদেশী হয়ে গেলাম। বিদেশী হয়ে রইলাম। নূতন মার সঙ্গে আমার কদাচিৎ দেখা হয়। দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে থাকি, পারত পক্ষে কথা বলি না। বাবার সঙ্গেও আমার সেই সম্পর্ক। বাবার সঙ্গে আরও কম দেখা হয় আমার। বাবা জোত-জমি নিয়ে ব্যস্ত। তহসিল নিয়ে ব্যস্ত। আমার বাবা এক জমিদারের ম্যানেজার। তাঁকে বিভিন্ন কাজে সদরে ছুটোছুটি করতে হয়। ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার সময় কোথায় তাঁর! আমাদের উভয়ের তরফ থেকে প্রাণের সে তাগিদও হয়ত নেই। আমি নিজেকে আমার ঘরে

বন্দী করে রাখি। সেইটুকুই আমার সমস্ত জগৎ। আমার গৃহশিক্ষক একজন সৌম্য প্রবীণ পুরুষ। আমাকে শিক্ষিত ও চরিত্রবান করে তুলতে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি নেই। তিনি আমার জন্যে সব করেন। স্কুলপাঠ্যের বাইরেও নানা বই আমার জন্যে কিনে আনেন কিংবা কারো থেকে চেয়ে আনেন, লাইব্রেরি থেকে আনেন, কাগজ কিনে আমার জন্যে নিজে হাতে খাতা তৈরি করেন, পেন্সিল ভেঙে গেলে তা ছুরি দিয়ে কেটে দেন, এমন কি আমার স্বাস্থ্য, আমার পোশাকও তাঁর চিন্তার এলাকায়। বুঝতে পারি বাবা তার পিতার কর্তব্য এই গৃহ-শিক্ষকের বেনামীতে সম্পন্ন করেই পিতার কাজ করে যাচ্ছেন ভেবে নিশ্চিন্ত থাকেন।

আমি লেখাপড়ায় মগ্ন হয়ে থাকি। যখন পড়াশুনা ভাল লাগে না, বন-বাদাড় দিঘির পাড় নদীর ধার চষে বেড়াই। বাড়ির কারো সঙ্গে বড় একটা কথা বলি না, মিশি না। বাড়ির সবায়ের ওপর, বাড়িটার ওপরেই আমার বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। যেখানে আমার মা নেই, আমার আন্নামা নেই, সেখানে আমিও নেই। আমি এ বাড়ির কেউ নয়। এ বাড়ি আমার না। আমি এ বাড়িতে থাকব না। কবে যাব, কোথায় যাব জানি না। কিন্তু যে কোন মুহূর্তে চলে যাবার জন্যে মন আমার ব্যাকুল হয়ে থাকে।

২

রূপনগর নগর নয়, বন্দরও না। তাই বলে সে গ্রামও নয়। বলা যায়, নগর হয়ে উঠতে উঠতে, বন্দর হয়ে উঠতে উঠতে সে কিছুই হয়ে উঠতে পারেনি, অথচ চরিত্র-ভ্রষ্ট হয়েছে। না হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ নাগরিক না থাকতে পেরেছে সম্পূর্ণ গ্রাম্য।

রূপনগরকে দু'ভাগ করে বয়ে গেছে একটি খাল। তারই সমান্তরাল মাইলখানেক অবধি ঝাউ গাছের পাড় বসানো মেটালড রোড—রূপনগরের রাজপথ। সে পথের সিকি মাইল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে থানা ট্রেজারি, ফৌজদারি দেওয়ানি আদালত, সরকারি স্কুল হাসপাতাল পোস্ট অফিস। কাচারি-পাড়া সরকারি বাসভবন নিয়ে রূপনগরের নগর হয়ে ওঠার চেষ্টা। আর এক পাড়ে বন্দর। সে পাড়ে সুপুরি-লঙ্কা-পাটের বড় বড় গুদোম আর গদির সারি, মুদি মনোহারি দোকান, সব্জি ও মাছের বাজার। তারই সামনে দিয়ে দূর-দূরান্তের গাঁয়ে-গঞ্জে চলে গেছে কাঁচা মাটির চওড়া রাস্তা—রূপনগরের জনপথ। সে পথ ধরে গোরুর গাড়ি মোষের গাড়ি লরি এসে মহাজনদের গদি-গুদোমের সামনে, বাজারের সামনে দাঁড়ায়। গদি গুদোম ও বাজারের পেছনে খালের পাড়ে সারি সারি খোঁটায় বাঁধা থাকে বড় বড় নৌকো; কিছু দূরে নোঙর করে থাকে স্লুপ সামপান। এ সব রূপনগরের বন্দর হয়ে ওঠার চিহ্ন। কিন্তু তাকে পুরোপুরি নগর কিংবা বন্দর, কিছুই হয়ে উঠতে দিল না রুপ্‌সি।

অথচ এই রুপ্‌সির রূপ দেখেই মুগ্ধ হয়ে সরকারি সারভেআরের শখ হয়েছিল, এখানে নগর গড়বে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম হয়েছিল, এখানে মহকুমা-সদর হোক।

যথা-আদেশ হতেও শুরু করল। কিছুদূর এগুলো। বিবিধ পণ্যে বোঝাই সুলুপ সামপান বড় বড় স্টীমার বিরাট বিরাট নৌকো রুপ্সির জল তোলপাড় করে যাতায়াত করতে থাকল। কিন্তু রাত দিন এত বোঝা দীর্ঘদিন রুপ্সি বইতে পারল না। রুপ্সির শরীরে সইল না। তার গা গুলিয়ে উঠল। রুপ্সির বুকের মাটি গলায় এসে জমল। তার মুখে চর পড়ল। নাগরী হয়ে ওঠার স্বপ্ন ভেঙে গেল রূপনগরের। স্বপ্ন ভেঙে দিল রুপ্সি। যারা সভ্যতার আলো পাবে বলে চঞ্চল উৎসুক হয়ে উঠেছিল তারা নেতিয়ে পড়ল। যারা লরি-বাস-মোটরের ধুলোয়, নাগরিক উত্তেজনা ও আধুনিকতার উগ্রতায় অস্থির হয়ে উঠেছিল তারা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। রুপ্সির ঘোলা জল থিতিয়ে নির্মল হল। তার স্বচ্ছ জলে আবার আকাশের ছায়া দেখা যেতে লাগল। তবু রূপনগর আর তার পূর্বস্বভাব ফিরে পেল না। গ্রামের শান্তি ও শহরের চাঞ্চল্য সহাবস্থান করছিল বটে; কিন্তু গ্রামের মানুষ সদরে এলে শহরের হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। গ্রামের স্পর্শে শহরের মনে সরম লাগে। মানুষের নীতিবোধ আচার-নিষ্ঠা ওলট-পালট হয়ে যায়।

আমি যখন পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যেতাম, যখন দেখতেন, আমি অবসন্ন অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছি, আমার মাস্টারমশায় আমাকে গল্প শোনাতেন। নানা বিখ্যাত বইয়ের গল্প। নানা দেশ-বিদেশের ইতিহাস। রূপনগরের ইতিহাসও আমি তার কাছে শুনেছি। আমার জন্মের আগেকার ইতিহাস। রুপ্সির ঘোলা জলে সুলুপ সামপান ভাসতে স্টীমার চলতে আমি কখনো দেখিনি। আমি তার স্বচ্ছ জলে বেলেহাঁস পানকৌড়ি ভাসতে দেখতাম। জলের ধারে ধারে বক আর কাদাখোঁচা পা টিপেটিপে হাঁটছে দেখতাম। গোরুর পাল নিয়ে চাষীদের রুপ্সি সাঁতরে পার হয়ে যেতে দেখতাম।

রূপনগরে আমার বড় টান ছিল রুপ্‌সি। আমি রুপ্‌সিকে বড় ভালবেসে ফেলেছিলাম। আমি ছুটে ছুটে ওর কাছেই আসতাম কেবল, ওর পাড়ে এসে বসে থাকতাম। আমাদের বাড়িটা ছিল শহর থেকে অনেক দূরে রূপনগরের একটেরেতে। রুপ্‌সির কাছাকাছি। আমাদের বাড়ির সামনে দিঘি পেছনে বন। সুপুরি-নারকেলের বাগান পেরিয়ে সুরু হয় হিজল চালতে তেঁতুল পলাশ গড়ান শিমুলের অরণ্য। সে অরণ্য ভেদ করে সরু সরু নানা পথ গেছে নানা দিকে। কোনো পথ বেয়ে চাষী ও চাষীবউ, বেদেনীরা বেসাতি মাথায় বাজার হাটে যাতায়াত করে। কোনো পথ বেয়ে রাখাল গোরু লাঙল নিয়ে মাঠে বেরোয়। দু' একটা পথ দূরের গাঁয়ে গঞ্জের দিকেও গেছে। কিন্তু এ অরণ্যের অনেক জায়গা আছে পথ-চিহ্নহীন দুর্গম। যে চেনে না সে অনায়াসে হারিয়ে যেতে পারে। আমি কতদিন হারিয়ে গেছি। হারিয়ে যেতে পারতাম বলে রুপ্‌সির পরে এ অরণ্যের ওপরেও আমার প্রবল টান ছিল। হারিয়ে যাবার উত্তেজনায় এ অরণ্যে নেমে আসতে আমার সময় অসময়ের জ্ঞান থাকত না।

এত বড় বাড়ির কে কোথায় আছি আমরা, কে জানে? কে কাকে ডাকবে? কার জন্যে কার দরদ? আমাদের বাড়িতে খাওয়ার ঘণ্টা পড়ে। দিনে চারবার। সকাল আটটায় আর বিকেল পাঁচটায় টিফিনের ঘণ্টা। দুপুর বারোটায় আর রাত দশটায় খাওয়ার ঘণ্টা। যারা স্কুলে পড়ি তাদের জন্যে সকাল সাড়ে ন'টায়, ঘণ্টা নয় ঘন্টি বাজে।

ঘণ্টা বা ঘন্টি বাজলে যে হাজির হবে সে-ই খেতে পাবে। যে হাজির হবে না, তার জন্যে কেউ বসে থাকবে না। আমার জন্যেও কেউ বসে থাকত না। বাবা, নূতন মার জন্যে কী ব্যবস্থা ছিল জানতাম না। আমি কখনো খোঁজ নেইনি। কারো

বিষয়ে কোনো বিষয়ে আমার কোনো কৌতূহল ছিল না। আম্মাদের পংক্তিভোজে কারা বসেছে, কারা খাচ্ছে, মাথা উঁচু করে দেখার উৎসাহ আমার থাকত না। আমি ঘণ্টা বাজলে গিয়ে খেতে বসতাম। মাথা নিচু করে খেতাম। নিঃশব্দে খেয়ে উঠে আসতাম। আমার কিছু চাই কিনা যেমন কেউ জিজ্ঞেস করত না তেম্নি আমিও কাউকে ডেকে কিছু চাইতাম না। লম্বা লম্বা তু'তিনটে সারিতে আমরা খেতে বসতাম। আমার ঘরে বসে সে স্মৃতি যখন মনে পড়ত মাঝে মাঝে আমার গা গোলাত। আমি মাঝে মাঝে খেতে যেতাম না। কেউ কিছু কড়মড় করে চিবুচ্ছে, কেউ কিছু হাপুস-হুপুস খাচ্ছে কিংবা গো-গ্রাসে গিলছে কেউ, দেখলে আমার ঘেন্না করত। ডাল তরকারি মাছ মাংসের গন্ধটাও আমার অসহ্য মনে হয়েছে কখনো কখনো। তাই না খেয়ে নিজের ঘরে শুয়ে থাকতে আমার কষ্ট হত না। বরং ভাল লাগত। আমার যত খিদে পেত ততই আমি বিষণ্ণ ও করুণ হয়ে উঠতাম। সেই করুণ বিষণ্ণ হৃদয় নিয়ে আমি 'আমার মায়ের ফোটোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আর আশ্চর্য এক খেলা দেখতাম সেখানে। ক্ষুধার্ত কিংবা খুব বিষণ্ণ থাকলেই এ খেলা আমার চোখে পড়ত। দেখতাম, আমার মায়ের শরীর আস্তে আস্তে আন্নামার মতন হয়ে উঠছে, আবার আন্নামা হয়ে উঠতে উঠতে মায়ের মতন হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

কিন্তু আমার মাকে আমি আর কখনো স্বপ্নে দেখিনি। পরম বেদনার সঙ্গে আমি অনুভব করেছি, আমি আর মাকে স্বপ্নে দেখব না। আন্নামাকেও যে আমি জন্মের মতন হারাব সেদিনের শেষ স্বপ্নের মধ্যে সে ইঙ্গিতও ছিল কি! আন্নামা মা হয়ে সূর্য-শরীরে মিশে গেছে। আমি তার বুক থেকে ছিন্ন হয়ে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়েছি। আমি পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ হয়ে

গেছি। এ পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। মায়ের ফোটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখ জলে ভরে উঠত, গাল বেয়ে নামত। আমি আকুল হয়ে ভাবতাম, আমার মা কেমন করে আমার মা হয়েছে? মেয়েরা কেমন করে মা হয়? আমি কি মায়ের শরীর থেকে জন্মেছি, তবে কোন্ পথে কেমন করে? যদি জানতাম, সে পথে আবার করে মায়ের শরীরে মিশে যেতে পারতাম।

মাস্টারমশায় আমাকে কত বই পড়তে দেন, কোনো বইতে এ প্রশ্ন থাকে না। মাস্টারমশায় কত কথা বলেন, কোনো কথাতে এ প্রশ্ন ওঠে না। আন্নামা বলবে বলেছিল। কী বলত সে?

এ সব ভাবনার সময় নূতন মার মুখটা মনে পড়ে আর ঘৃণায় খিৎখিতিয়ে উঠি আমি। মনে হয় যেন একটা মরা পচা বেড়ালের শরীরে পা দিয়েছি। তক্ষুনি ছুটে পালাই। এ বাড়িতে এক মুহূর্তও আর থাকতে মন চায় না। অরণ্যই তখন আশ্রয় আমার অথবা রূপ্সির তীর।

ভাত জোটে না বটে কিন্তু অরণ্যে উপবাসী থাকে না কেউ। জাম জামরুল কাউ কামরাঙা ডেঁও পেয়ারা লিচু সফেদ আম কাঁঠাল বৈঁচি ফলসার অজস্র বৃক্ষে অরণ্য অন্ধকার। অরণ্য পার হয়ে যদি যাও ক্ষেতে মিলবে ক্ষীরাই ফুটি তরমুজ আখ। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে তাই আমার কষ্ট ছিল না কিছু। স্কুল ছুটির দিনে প্রায়ই এ কাণ্ডটি ঘটত। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতাম। অরণ্যের গভীরে চলে গেছি অজ্ঞাতসারে। শেয়াল শূয়ার দেখে ভয় পেয়েছি। ঝিঁঝি মৌমাছির একটানা গান ও পাখির ডাকের অন্তরালে ছায়াময় নিতল স্তব্ধতাকেও কম ভয় করত না। কিন্তু সে ভয়কে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম।

আমি আপন মনে ঘুরে বেড়াই বনের মধ্যে, ক্ষুধার কষ্ট মনে থাকে না, আসলে ক্ষুধা বোধই থাকে না তখন। অনেক দিন অরণ্য-পথের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছি।

'আহা গো, কার ছেলে!'

'কী সর্বনাশ!'

সন্ত্রস্ত গলার স্বরে জেগে উঠেছি। ঘুম চোখে মনে হয়েছে, স্বপ্ন দেখছি, যেন আন্নামা, যেন আমার মা। আমার সামনে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে।

ততক্ষণে মাথার বাজরা নামিয়ে রেখে তারা বসে পড়েছে আমার সামনে।

একজন আঁচল টেনে আমার মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে, গা ঝেড়ে দিচ্ছে।

আর একজন করুণ গলায় বলছে, 'আহা গো, মুখখানা বাসি ফুলের লাখান শুকিয়ে গেছে। কিছু খায়নি বুঝি সারা দিন।' সে তার বাজরা থেকে কলা ক্ষীরাই তুলে দিয়েছে। 'খাও। খেতে খেতে ঘরে চলে যাও। কোথায় তোমার ঘর?'

ইচ্ছে হয়েছে ওর গলা জড়িয়ে ধরি। এ আদর ত আমার বাড়িতে নেই।

বলি, 'আমার ঘর নেই। আমাকে তোমাদের ঘরে নিয়ে চল।'

'ওমা ঘর নেই কি গো!'

'নিশ্চয় রাগ করে ঘর থেকে পালিয়েছ।'

'শিগ্‌গির ঘরে যাও। তোমার মা ভীষণ মারবে দেখো।'

'আমার মা নেই।'

ওদের দিকে তাকিয়ে আন্নামার জন্যে আমার বুকটা হুহু করে ওঠে।

আমার ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে একজন আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুমু খায়।

'আহা, এমন সোনার কার্তিক ছেলে ফেলে আভাগী মরল কেমন করে ?'

'ইচ্ছে করে নৌকোয় নিয়ে যাই।'

'আমি যাব।' আমি আকুল গলায় বলি। আমি তার আঁচল ধরি।

শিউরে ওঠে সঙ্গিনী, 'বেদের নৌকোয় এমন ভোমরার লাখান কালো চোখ আর এমন সোনার লাখান রূপ দেখলে লোকে ভাববে না, এ ছেলে তুই চুরি করে এনেছিস ? তুই কি ফাটকে যেতে চাস ? চল, আর আদেখলেপনা করতে হবে না।'

সঙ্গিনীর হাত ধরল সে। তাকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে আমাকে বলল, 'খোকা, ঘরে যাও।'

আমার এক হাতে কলা আর এক হাতে ক্ষীরাই। আমি ওদের দিকে তাকিয়ে আছি। ওরা দেখতে দেখতে গাছ জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

তারপর আমি ওদের অনেক খুঁজেছি। খুঁজে পাইনি। তখন মনে হয়েছে, সত্যি নয়, আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম। মনে হত, বনের মধ্যে আবার ঘুমিয়ে পড়তে পারলে ওদের সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু মনের মধ্যে প্রতীক্ষা থাকলে ঘুম আসে না। আমার ঘুম আসত না। তবু অনেকদিন চোখ বুজে পড়ে থেকেছি। একবার একটা শেয়াল তাড়া করেছিল। আর একবার একটা বনবেড়াল পিঠে আঁচড়ে দিয়েছে।

অরণ্য আমাকে চরম আকর্ষণ করত ফাল্‌গুন চৈত্র মাসে। আকাশ আর্শির মতন ঝকঝক করত। এলোমেলো বাতাস বইত। ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি উড়ত। বউলের গন্ধে চারদিক আচ্ছন্ন হত। নিস্তব্ধ নিশুতি-বিজন হয়ে যেত দুপুর। অরণ্যের ডাক আমাকে পাগল করত তখন। আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে অরণ্যে উন্মাদের মতন ঘুরতাম।

সেই শেষ চৈত্রে অরণ্যের দূর প্রান্তে আমি একটা দিঘি আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম। তার শান-বাঁধানো ঘাট মাঝখানে ফেটে দু'দিকে কাত হয়ে আছে। আমি সেই ভাঙা-ঘাটে এসে দাঁড়াতে আশ্চর্য এক দৃশ্য চোখে পড়ল। স্বচ্ছ জলের তলায় অনেক দূর পর্যন্ত সিঁড়ি দেখা যায়; তারপরে জলের অন্ধকারে মিশে গেছে। হাওয়ায় দিঘির জল অল্প অল্প কাঁপছিল। আমার ভাবতে ভাল লাগছিল, এই মাত্র এক রাজপুত্র তার রাজকন্যাকে উদ্ধার করবার জন্যে ওই সিঁড়ি বেয়ে পাতালে নেবে গেছে। রাজপুত্র অদৃশ্য হয়ে গেছে কিন্তু তার তলোয়ারের আঘাতে জলে যে ঢেউ উঠেছিল এখনও তা মিলোয়নি। আমি সিঁড়ির ওপর বসে পড়লাম। আমার যেন আশা, রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে এখনি উঠে আসবে। পত্র-পল্লবের ফাঁক ফোকর দিয়ে পড়ন্ত বেলার আলো দিঘির চঞ্চল জলে জাফরি কেটেছে। মনে হচ্ছে যেন নানা রঙে একখানা সূক্ষ্ম শাড়ি বোনা হচ্ছে। দৈত্য-দানোর মন্ত্রে অবশ বিবসনা রাজকন্যাকে পরানোর জন্যেই যেন কোন অদৃশ্য হাত নিঃশব্দে এই বুটিদার রঙিন শাড়ি বুনে চলেছে। আমি অপলক তাকিয়েছিলাম।

'তুই কে, তুই এখানে কেনে?'

মেঘের মতন রঙ কচি তলতা বাঁশের মতন ছিপছিপে মেয়ে তার কাঁখের ঘড়া পৈঠায় রেখে আমার সামনে বসল।

এমনভাবে সে আমার সামনে এসেছে, আমার কাছে বসল, আমি চমকে উঠলাম না, যেন আমার স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়েই নেমে এসেছে সে। আমি মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম। দিঘল দুই ভুরুর নিচে বড় বড় দুটি চোখ আমাকে অপলক হয়ে দেখছিল।

'কি দেখছ?' আমি শুধালাম।

'আমার নওয়লা রাজারছেলেরে।' সে হাসল।

হেসে সে আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। নিমেষে চুমোয় চুমোয় সে আমাকে রুদ্ধশ্বাস করে ফেলল। তার কালো চুলের এলো খোঁপায় গোঁজা বুনো-ফুলের চঞ্চল গুচ্ছটা আমার বিহ্বল চোখ মুগ্ধ করে রাখল। নিমেষ পরে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'ওদিকে মরদরা মাংস বানাচ্ছে চল্ আমরা ইদিকে পালাই।'

আমাকে টেনে তুলল সে। আমার হাত ধরে ছুটতে লাগল।

সে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে। কেন নিয়ে যাচ্ছে। এক অজানা রহস্যের দিকে আমি বিস্মিত হয়ে ছুটছিলাম।

'সখিয়ারে তু কাঁহা?'

একটা প্রশ্নের চিৎকার এসে বিদ্ধ করল আমাদের।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা।

'যাঃ লছমিয়া দেখে ফেলেছে!'

হতাশ হয়ে আমার হাত ছেড়ে দিল মেয়ে।

আমি বৃক্ষের মতন স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

তার মেঘরঙ শরীর অরণ্য-ছায়ায় পলকে মিলিয়ে গেল।

আমার সম্বিৎ ফিরতে সময় লাগল অনেক।

সেদিন সেই দূরের অপরিচিত পথে বারবার পথ ভুল করেছি। বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। রাত হয়ে গিয়েছিল।

বাড়িতে পা দিতেই কে একজন বলে উঠল, 'এই যে শানু।'

সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠের সোরগোল পড়ে গেল।

'শানু এসেছে?'

'কই শানু?'

'এই ত, ঐই যে।'

বাবা ছুটে এলেন, মাস্টারমশায় ছুটে এলেন, পর্যন্ত নূতন মা।

বাবা আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন আমার ঘরে।

'কোথায় ছিলি তুই সারা দিন?' আমার হাত ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে তিনি জানতে চাইলেন।

'বল কোথায় ছিলি?'

অধৈর্য পিতার কণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হচ্ছে।

'বল কোথায় ছিলি?

'বল।

'বল।'

আমি কথা না বলে জবাব না দিয়ে কারো দিকে না তাকিয়ে চুপ করে আছি।

নূতন মা তখন ক্রুদ্ধ গলায় বলে উঠল, 'এই গোঁয়ার গোঁজ জেদী ছেলে জবাব দেবে ভেবেছ? ও কারো কথার জবাব দেয় কখনো দেখেছ? অন্নই ওকে নষ্ট করেছে। আমি হাজার বার বারণ করেছি, ওই বদমাস মাগীর কাছে ওকে যেতে দিও না, শুতে দিও না।' দাঁতে দাঁত ঘষছিল নূতন মা। গোখরোর মতন ফুঁসছিল নূতন মা। মাস্টারমশায়কে নিয়ে পড়ল, 'আপনি দেখেন না! আপনি কী করেন? আপনাকে রাখা হয়েছে কী জন্যে?'

'ছি ছি, কাকে কী বলছ?' বাবা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'ক্ষীরোদবাবুর কী দোষ, উনি কী করবেন? এত বড় বুড়োধাড়ী ছেলে আজ বাদে কাল যে ম্যাট্রিক দেবে, উনি কি তাকে কোলে পিঠে করে রাখবেন? নাকি ওর পেছনে চব্বিশ ঘণ্টা লেগে থাকবেন?'

নূতন মা মাথা দোলালো, যেন সাপিনী ফণা দোলাচ্ছে, বলল, 'ঠিক, আমারই ভুল, আপনি যথেষ্ট করছেন, এর থেকে

বেশী আর কী করবেন? আসলে পেটের দোষ, নষ্ট মেয়েমানুষের পেটে যা হবার তাই হয়েছে।'

শুনে আমি চমকে উঠেছি। আমার চোখ বিস্ফারিত হয়েছে। সেই বিস্ফারিত চোখে আমি নূতন মা-র দিকে তাকিয়েছি। তার মুখে নয় তার পেটের ওপরে চোখ পড়ে রয়েছে আমার। ওই পেটে ছেলে হয়? আমি ওই পেটে হয়েছি? কিন্তু ওই পেটে এতখানি জায়গা কোথায়, দরজা কোথায় যাতায়াতের? আমার বিস্ময়ের যেন অবধি ছিল না।

আমাকে অমন করে তাকিয়ে থাকতে দেখে বাবা গর্জে উঠলেন, 'হাঁ করে দেখছিস কী, কথার জবাব দে।'

বাবা আমার হাত ধরে খুব জোরে একটা ঝাঁকুনি দিলেন এবং উত্তর না পেয়ে আমার টেবিল থেকে শক্ত কাঠের মোটা স্কেলটা তুলে পিঠে পাঁজরায় ঊরুতে কষে কয়েক ঘা মারলেন। মাস্টারমশায় ছুটে এসে ধরতে গিয়েছিলেন তার আগেই স্কেলটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল।

বাবা ক্রোধে কাঁপছিলেন। বসে পড়ে বললেন, 'ফের যদি আর না বলে কোথাও গেছিস, মেরে হাড় ভেঙে দেব।'

যিনি কোনদিন আমাকে এতটুকু আদর করেননি, একটা মিষ্টি কথা বলেননি ডেকে, যার সঙ্গে আমার অন্তরের কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, তিনি আজ আমাকে মেরে বসলেন। আরও মারবেন বলে শাসালেন। আমি এতটুকু প্রস্তুত ছিলাম না এর জন্যে। তবু বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করলাম না। বরং আমার জেদ আমার সঙ্কল্প মনের মধ্যে আরও স্পষ্ট আরও সোচ্চার হল।

এরা আমার কেউ নয়। আমি এ বাড়ির কেউ না। আমি এখানে থাকব না।

অথচ আছি।

অথচ তারপরে এমন ঘটনা আর ঘটেনি।

তারপরে আমি আর বেরোইনি বাড়ি থেকে। মা বাবা ভাবলেন মারে কাজ হয়েছে। মাস্টারমশায় ভাবলেন, এ তাঁর শিক্ষাদানের গুণ, তাঁর সতর্ক দৃষ্টির ফল। আর আমি নিষ্ফল মুহূর্ত গুনি ঘরে বসে বসে।

গ্রীষ্ম যায় বর্ষা আসে, আষাঢ়ের আকাশ ঝেপে বৃষ্টি নামে মাটিতে। বর্ষার অরণ্য দুর্গম হয়। বেত চৈ অরণ্যলতারা শুধু নয়, ময়না শিয়াকুলকাঁটারাও লকলকিয়ে বাড়ে। লতাগুল্মে কাঁটার জঙ্গলে অরণ্যভূমি আবৃত হয়। দেখতে দেখতে কুলবধূর মতন শান্ত নম্র রূপসিও ভীষণা রুদ্রাণীর মূর্তি ধারণ করে। কূল ছাপিয়ে তার জল ক্ষেতে ওঠে, চাষীদের উঠোনে ঢোকে, অরণ্যের মাটিও তখন তার জলে থৈ থৈ করে। অরণ্য নদী তখন আর কুহকিনীর মতন হাতছানি দিয়ে ডাকে না। ভৈরবীর মতন ভ্রূকুটি করে ভয় দেখায়। সে ভয়ে ঘরের মানুষ বনে নদীতে যাবে কী নদী-বনের জীবেরাই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। শেয়াল শূয়ার সাপ গৃহস্থ বাড়ির আনাচে-কানাচে আশ্রয় নেয়, নদীর মাছ খালে বিলে পুকুরে চলে আসে।

আমি ঘরে বসে আকাশে মেঘের খেলা দেখি, মাটিতে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়া দেখি, প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার মুখে বিপুল বিপুল মহীরুহের অসহায় মাথা-কোটা দেখি। অথবা বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকি। হাঁ, অরণ্য-নদীর কুহকে আমি পথ হারাই ঠিক কিন্তু পুঁথিপত্রের জটিল প্রশ্নগুলিও আমাকে কম আকর্ষণ করে না। অরণ্যের ছায়ার গভীরে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে কখনো কখনো আমি যে আনন্দ পাই, কোন একটি বাক্যের নিগূঢ়ার্থ সম্প্রসারণ করতে তার চেয়ে কম আনন্দ পাই না। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমি সহসা বহির্জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনে গৃহবন্দী করেছি। এ

বাড়ির একজন বিশিষ্ট কেউ হয়ে উঠতে পণ করেছি আমি। না। কখনো তা নয়। আমি এ বাড়ির কেউ নয়। এ বাড়ির একজন হয়ে উঠতে আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। আমার আকর্ষণ?

আমি শিউরে উঠি। বহু দিনের দেখা সেই বেদেনীর চোখজোড়া আমার চোখে ভেসে ওঠে। সেই মেঘ-বরণ কন্যার বর্ষার বংশাঙ্কুরের মতন শরীর আমার হাত ধরে টানে। আমি পসারিণীর চোখে আমার মায়ের চোখ দেখেছি, আমি যাযাবরীর তনু দেহে আমার মায়ের শরীর স্পর্শ করেছি। আমি তাদের খুঁজে বের করব। আমি তাদের কাছে চলে যাব।

ভাবতে ভাবতে আমার মন শ্রাবণের আকাশের মতন বিষণ্ণ কাতর হয়ে ওঠে। শ্রাবণের ধারার মতন সে কাতর বিষণ্ণতা আমার মনের মাটি ডুবিয়ে দেয়, আমার সত্তা শুদ্ধ চোখের জলে কানায় কানায় ভরে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে কখন আমি বইয়ের ওপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ি।

মাস্টারমশায় এসে অবাক হয়ে যান।

'কী ব্যাপার, তুমি কাঁদছ কেন?'

গলার স্বরে বুঝি, তাঁর মন আর্দ্র হয়েছে। তিনি করুণায় বিগলিত। তখনই আমার মন শক্ত হয়ে ওঠে। আমি তাঁকে প্রশ্রয় দেই না। করুণা ভিক্ষা করতে আমার ঘৃণা করে। আমি অপমানবোধ করি। আমি উঠে বসি। চোখ মুছে ফেলি। যে বই সামনে থাকে তার কোন একটা পাতা বের করে দিয়ে বলি, 'এ জায়গাটা বুঝিয়ে দিন।'

আমার নিস্পৃহ শীতল স্বরে তিনি চমকে ওঠেন। চকিতের জন্যে আমার দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেন। বইয়ে মনোযোগ দেন তিনি।

দিন কাটে।

দুর্গম অরণ্য সুগম হয়। লতাগুল্ম কাঁটাগাছ, গাছের ডাল কেটে

কেটে চাষীরা, পসারিণীরা, ভিন গাঁয়ের মানুষেরা দূরপাল্লার সোজা পথ বের করে। পায়ে পায়ে সরু সিঁথির মতন পথ পড়ে আবার। রূপ্সির জল নেমে যায়। মাঠ ঘাট শুকোয়। শ্রাবণের জলভরা কালো মেঘ শরতের রৌদ্রে শুকিয়ে পেঁজা তুলোর মতন সাদা আর হালকা হয়ে হাসে। আকাশের নীলে পাখিরা ডানা মেলে দেয়। মন্থর বাতাসে ভেসে আসে অরণ্যের ডাক। কাশফুল দুলিয়ে দুলিয়ে হাতছানি দেয় রূপ্সি। ঢাক-ঢোল বাজে। পাড়ায় পাড়ায় সাড়া পড়ে যায়। পুজো এসে গেছে। আমি বইয়ের মধ্যে তবু মুখ গুঁজে রাখি। আমি সাড়া দেই না। বলি, 'অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর।'

পুজোর পরে টেস্ট তারপরে ফাইন্যাল। আমি আমার মাকে ভুলে থাকতে, আন্নামাকে ভুলে থাকতে আমার বন্ধনের যন্ত্রণাকে ভুলে থাকতে স্বেচ্ছায় যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম তার শেষ আসন্ন। আমার স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব সুসম্পন্ন করার মধ্যেই যেন আমার মুক্তি নিহিত, মুক্তি অবধারিত। আমি যেন ছিন্ন-বন্ধন পাখি হয়ে যেতে পারব তখন।

পাখি হয়ে উড়ে যাবার সেই স্বপ্ন অবশেষে সত্য হল চৈত্র শেষের ঝরা পাতার দিনে।

শুকনো পাতা পায়ের তলায় মুড়মুড় করে ভাঙে। মুকুলের ঝরা মধু পায়ের তলায় লেগে চট্‌চট্‌ করে, বন থেকে বনান্তরে ঘুরতে ঘুরতে ভিজা মাটি হাঁটু অব্দি ওঠে কিন্তু সেদিনের বেদেনীর সে চোখ জোড়া, সেদিনের সে যাযাবরীর মেঘরঙ তনুদেহ আর চোখে পড়ে না। হতাশার সেই দুঃখে আমি অরণ্য ছেড়ে রূপ্সির তীরে এসে বসি। রূপ্সির জলে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করি, আমার মনের স্বপ্নগুলি রূপ পেতে চায়। আমি রূপ্সির কাদামাটি তুলে এনে মূর্তি গড়তে থাকি। মূর্তি গড়তে গড়তে তন্ময় হয়ে যাই। আমার অপটু হাতে কিম্ভূতকিমাকার বিচিত্র সব জীব জানোয়ার

জন্ম লয়। তাদের কারো শরীর জুড়ে পেট তাতে মস্ত বড় দরজা কারো সর্বাঙ্গে সবচেয়ে বড় তার শিশ্ন। আমি আড়ষ্ট বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকি তাদের দিকে, বুঝতে পারিনা এরা কারা, কেন আমার হাতে এমন করে মূর্ত হচ্ছে। আমি ভয় পাই। তবু সৃষ্টির এক প্রচ্ছন্ন প্রেরণা থেকে আমি মুক্তি পাই না। আমি ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে পড়ি। সেই ঘুমের মধ্যে আমার সৃষ্ট জীবেরা সব জীবন্ত হয়ে ওঠে। আমাকে ঘিরে তারা বিচিত্র এক উৎসবে মাতে। তাদের মুখে বোবার কণ্ঠের নিরর্থক স্বর। তাদের কোন ভাষা নেই। তারা তাদের সেই উৎসবের মধ্যে উন্মত্ত হয়ে উঠে নাচতে নাচতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, একে অন্যের শরীরে ক্ষণকালের জন্যে নিঃশেষে মিশে যায়। আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পুনরায় মিলেমিশে একাকার হয়। তাদের সেই কিম্ভূতকিমাকার মুখ ও আকৃতি কি এক দাহে ক্ষণে ক্ষণে ভীষণ হয়ে ওঠে। আমি শিউরে উঠি। চিৎকার করতে থাকি। আমার সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। আমি জেগে যাই।

একদিন সেই অপরিচিত জগতের অদ্ভুত প্রাণীদের মধ্যে এক আশ্চর্য মুখ দেখতে পেলাম। আমি যখন সেই অদ্ভুতদর্শন প্রাণী জগতের মধ্যে অসহায় হয়ে মৃত্যু ভয়ে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছি তখন দেখি সেই মুখ। আমার মুখের ওপরে মুখখানি নত হয়ে আছে। তার ডাগর দুই চোখে সেই বেদেনীর মনের মমতা ছলছল করছে, তার বঙ্কিম গ্রীবায় সেই যাযাবরী মনের রহস্য ধরা দিয়েছে। মৃত্যু ভয় থেকে মুক্তি পেতে আমি দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরলাম। তখনই আমার ঘুম ভেঙে গেল। যে জীব জানোয়ারগুলি আমাকে ভীষণ মূর্তি ধরে ভয় দেখাচ্ছিল তারা মিলিয়ে গেল, কেবল সেই সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল চোখ মেলে হাসতে থাকল আমার মুখে তাকিয়ে। আমার বিস্ময়, আমার কৌতূহল, আমার উদগ্র প্রশ্ন নিমেষে তার উষ্ণ ঠোঁটের নিচে চাপা পড়ে গেল। কানে এল একটি স্বর, 'তুমি বড় সুন্দর, বড় মিঠে।'

কিন্তু সে যে আমার কাছে কী আমি বলতে পারলাম না। আমি তাঁকে দুহাতে সাপটে ধরে আন্নামায়ের মতন আমার শরীরের সঙ্গে লেপটে দিতে চাইলাম। সে ত্রস্তে সরে গিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'এখানে না, এখন না।' সে আঙুল বাড়িয়ে ক্ষেতের মধ্যে একটা খড়ের মাচা দেখিয়ে বলল, 'রাত্রে, ওখানে।'

পাকা ধান শেয়াল শূয়ারে নষ্ট করে বলে চাষীরা মাচা বানিয়ে সারা রাত জেগে পাহারা দেয়। ধানকাটা কবে সারা হয়েছে মাচাটা তখনও তেমনি আছে। আমি খড়ের মাচা থেকে চোখ ফিরিয়ে আনতে না আনতে সে শিমুল গাছের শিকড় বেয়ে রূপ্‌সির উঁচু পাড়ের নিচে মিলিয়ে গেল।

'স্বপ্ন দেখলাম, না সত্য?' জানি না। আমি চোখ বুজে ফেললাম। সেই শিমুল গাছের নিচে আবার শুয়ে পড়লাম আমি। অরণ্য থেকে ছুটে এসে দক্ষিণের দুরন্ত বাতাস ক্ষণে ক্ষণে চৈত্রের উত্তাপকে উড়িয়ে নিয়ে শস্যশূন্য ক্ষেতের ওপর দিয়ে হা-হা করে বয়ে যাচ্ছে। আমি তার শীতল শুশ্রূষার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন জেগে উঠলাম বনের ওধারে তখন সূর্য ঢলে পড়েছে। রোদ উঠে গেছে গাছের মাথায়, শীতলপাটির মতন ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে। মেঘের গায়ে কমলালেবুর রং লেগেছে, তারই ছায়া রূপ্‌সির জলে পড়ে হলুদ-গোলা রং হয়েছে।

ক্ষিধে পেয়েছিল। সারাদিন খাইনি। হাসি পেল। সেই পুরোনো দিনটার ছবি মনে পড়ে।

'শানু এসেছে।'

'কই?'

'এই ত, এই যে।'

তারপর সেই সোরগোল।

আজও কী বাড়িতে সোরগোল? মাস্টারমশায়ের কাছে শুনেছি, 'তুমি খুব ভাল ছাত্র হয়েছ শুনে তোমার বাবার বড় গর্ব। তিনি

তোমায় খুব ভালবাসেন। কাছে আসবেন না, আদর করবেন না। পাছে লাই পেয়ে নষ্ট হয়ে যাও।'

শুনে আমি চুপ করেছিলাম। শক্ত হয়েছিলাম। একটা কথাও বলিনি। এখন হাসতে ইচ্ছে করছিল।

• আমি উঠে দাঁড়ালাম। প্রায় দৌড়ে রূপ্‌সির ঢালু পাড়ে নেমে গেলাম আমি। ক্ষীরাই ক্ষেত থেকে কিছু কচি ক্ষীরাই তুললাম, ফুটির ক্ষেত থেকে একটা পাকা ফুটি। ক্ষেতের আলে বসেই পকেট থেকে পেনসিল-কাটা ছুরি বের করে সেগুলি কেটে কেটে খেলাম। তারপর গাছে চড়ে ডাব পাড়লাম এক কাঁদি। ছুরি দিয়ে বোঁটা ফুটো করে দুটো ডাব খেয়ে নিলাম। পেট বোঝাই হয়ে গেল। বাকিগুলি পড়ে রইল শিমুল তলায়, আবার যদি পিপাসা পায় খাব, নয়ত পড়ে থাকবে। আমি এসে বসলাম শিমুলের শিকড় চেপে। আকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু তারা, মাটিতে ধূপছায়া অন্ধকার। চরাচরে কোথাও এক ফোঁটা আলো নেই। দুচারটে জোনাকি শুধু আলো জ্বেলে জ্বেলে পথ দেখছিল। সামনে রূপ্‌সি। তার জলের রেখা সাদা ফিতের মতন দেখাচ্ছে।

চিন্তা করছিলাম, কেন বসে আছি?

বন থেকে পাতার ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ ভেসে আসছে। মাটির পোকারা ডেকে চলেছে অনবরত। ক্ষেতের মধ্যে দুটো তাল গাছ। তার মাথায় শকুন বাসা বেঁধেছে। শকুনশাবক কঁকিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। আমার মাথার ওপরে শিমুল গাছের ডালে বসে থেকে-থেকে একটা পেঁচা ডেকে উঠছে। অরণ্য বলে কিছু চেনা যাচ্ছে না। যেন চাপ চাপ কালো মেঘ জমাট বেঁধে পাহাড় হয়ে আছে সেখানে। এই জনশূন্য অন্ধকার অরণ্য প্রান্তরের মাঝখানে নদীর ধারে কেন একা বসে আছি? দুপুরের রৌদ্রে যে সত্য স্বপ্ন হয়ে চলে গেছে এই অন্ধকারে সে স্বপ্ন সত্য হয়ে আমাকে স্পর্শ করবে, তাই কী? কিন্তু সে কি দুরাশা নয়? তবু হোক দুরাশা, আমি চিন্তা

করলাম—তুরাশাকেই ত আমি খুঁজতে বেরিয়েছি, তুরাশাকেই খুঁজে বেড়াব আজ থেকে।

চিন্তা করে শান্ত হল মনটা, তখন মনে পড়ল অন্য কথা, অরণ্যের হিংস্র জানোয়াররা অন্ধকারে পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, গ্রামে গ্রামে হানা দেয়, হায়েনা শিয়াল শূয়ার কত কী! মৃত্যু ভয় আর বেঁচে থাকার ইচ্ছা পেনসিল-কাটা ছুরিতে এসে মুষ্টিবদ্ধ হল কিন্তু ওইটুকু ছুরিতে কী হিংস্র আক্রমণ ঠেকানো যায়। কী করা যায় তবে? তখনই চাষীদের পরিত্যক্ত সেই মাচার কথা মনে পড়েছে। ভয়ে অসহায় বোধ করছিলাম এবার সাহস ফিরে এল মনে। উঠতে যাব, কে আমার কাঁধে হাত রাখল। উঃ কী ভয় পেলাম, কী ভয় কী ভয়। ধক্ করে উঠে বুকটা যেন এক নিমেষে থেমে গেল। চিৎকার করতে গিয়ে মুখের মধ্যে জিভটাকে খুঁজে পেলাম না। সর্ব শরীরে শক্ত হয়ে গেছি। একটা মৃদু ফিস্‌ফিস্ শব্দে প্রাণ ফিরে পেলাম।

'তুমি সেই থেকে বসে থাকবে জানতাম। তোমার জন্যে ভাত এনেছি।'

তখন রূপ্‌সির দূর বাঁকে আধখানা ভাঙা ময়লা কাঁসার থালার মতন একফালি চাঁদ উঠেছে। তার নিস্তেজ আলো মরা নদীর স্রোতের মতন আস্তে আস্তে অন্ধকারের শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল, অল্পে অল্পে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। দেখতে দেখতে আমার স্বপ্নের মানুষটি আমার চোখের সামনে সত্যি হয়ে উঠল।

সে গামছা-বাঁধা পুঁটলিটা খুলেছে। মাটির সানকিতে এক গাদা ভাত। তার এক পাশে মাছের পাতুড়ি। আর এক পাশে আলু কুমড়ো দিয়ে কুঁচো চিংড়ির ঝোল। ঝোল ভাতের তলায় চলে গেছে। পাতুড়ি আর আলু কুমড়ো চিংড়ি মাছ বেছে বেছে সে গামছায় তুলে রাখছিল। এখন তলাকার ঝোল দিয়ে উলটে পালটে ভাত মাখছিল মেয়ে।

আমি তাকে দেখছিলাম।

'তোমার নাম কি ?'

সে আমার দিকে চোখ তুলে নিঃশব্দে হাসল।

চোখের কোলে ঠোঁটের কোণায় কোণায় চাঁদের আলোর মতন রহস্যময় হয়ে উঠল সে হাসি।

সে আমার মুখে এক গ্রাস ভাত তুলে দিল।

বলল, 'নামের দরকার কী ? আমি মেয়ে তুমি মরদ।'

সে মুখ বাড়িয়ে আমার গালে টস্‌টস্‌ করে কয়েকটা চুমু খেল। নিঃশ্বাসের স্বরে বলল, 'তুমি মিঠে ভারি মিঠে।'

আমি তার মুখে একগ্রাস ভাত পুরে দিলাম।

সে ভাত চিবুতে চিবুতে বলল, 'জানো আমিও খাইনি। এক সঙ্গে খাব বলে ভাত নিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

'তুমি কোথায় থাক ?'

'বলব না।'

'এখান থেকে ফিরে গেলে তোমাকে মারবে না ?'

'এমন মরদ পেলে মার খেয়ে সুখ।' সে হেসে উঠল। হঠাৎ যেন আমাদের পুজোর ঘরে রুপোর ঘন্টিটা বাজিয়ে দিলেন ঠাকুরমশায়।

সারাদিনের ভাতের ক্ষুধা ঝোল পাতুড়ির গন্ধে তীব্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ক্ষীরাই ফুটিতে ভরা পেটে বেশী ভাত ধরল না। কিংবা স্নেহ পাওয়ার জন্যে মমতা পাওয়ার জন্যে আকুল দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরবার ক্ষুধায় অস্থির হয়ে উঠেছিলাম বলে ভাত খেতে আর ইচ্ছে যাচ্ছিল না। আমি গামছায় হাত মুখ মুছে নিয়ে ডাব খেলাম। একটা ডাবের মুখ ফুটো করে ওকেও এনে দিলাম।

ওরও যেন ভাত বেশী রুচছিল না। ও-ও বুঝি অন্য ক্ষুধায়, ভালবাসার ক্ষুধায় জ্বলছিল। ডাব দেখে সানকি সরিয়ে রেখে গামছায় হাত মুখ মুছল। ঢক্‌ঢক্‌ করে খেয়ে নিল ডাবটা।

আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে মাচায় এসে উঠলাম।

পুরু করে খড়-পাতা বিছানা। মাথার ওপরে একখানা খড়ের চাল মাত্র। চারদিক খোলা। অনেক উঁচুতে উঠেছে এখন চাঁদ। অনেক উজ্জ্বল হয়েছে। খড়ের বিছানায় ছড়িয়ে সাদা মলমলের চাদর হয়ে আছে জ্যোৎস্না।

আমি জামা হাফ-প্যাণ্ট খুলে ফেললাম।

'তর সইছে না।'

ঘাড় কাত করে দেখছিল। হেসে উঠল মেয়ে। নিজের একমাত্র বসনখানা খুলে রাখল এক পাশে।

আমি শুয়ে পড়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম।

ক্লাস ফোরে উঠে হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম আমি, সে আজ বছর সাত আগেকার কথা। সাত বছর হল আন্নামা চলে গেছে। সাত বছর পরে হঠাৎ যেন আন্নামাকে ফিরে পেলাম। এমন রিমরিমে জ্যোৎস্না, এমন নির্জন প্রান্তর, নদীর কুলকুল শব্দ, ঝিঁঝির ডাক, শকুনের কান্না, শেয়াল হায়েনার নিঃশব্দ ঘোরাফেরার মধ্যে রাত্রি অলৌকিক না হয়ে উঠলে বুঝি এমন দুরাকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন কখনো সত্য হয় না।

আমি প্রাণপণে দুহাতে বেষ্টন করলাম মেয়েকে। ওর উরুর ভিতরে আমার উরু রাখলাম, ওর বুকের মধ্যে মাথা গুঁজলাম আমি। আমি আন্নামার শরীরের উত্তাপে পুড়তে থাকলাম, আমি জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে ওর শরীরে মিশে যেতে চাইছি।

বেলফল মতন সুডৌল অথচ ময়দার ডেলার মতন নরম দুটি স্তন। আমি অস্থির হয়ে গালে ঠোঁটে ঘষছিলাম। এক সময়ে মুখে পুরে চুষতে লাগলাম।

আমার দৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে অলস হয়ে ছিল মেয়ে, এবার কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকল, একবার শক্ত একবার নরম হতে থাকল, তারপর সহসা সজোরে দুহাতে আমাকে স্তন থেকে সরিয়ে দিল।

খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়ে।

'আমি ভাবলাম না জানি কী সেয়ানা আমার মরদ। ও মা এ যে দুধের শিশু, এখনো মাই টানে।'

একটু থেমে ধমক দিল মেয়ে।

'বোকা কোথাকার।'

এবং নিমেষে সে আমাকে চতুর করে তুলল। এক আশ্চর্য রহস্যের দরজা খুলে দিল আমার কাছে। আমার তৈরি মূর্তিগুলি আমার স্বপ্নে জীবন্ত হয়ে আমাকে ঘিরে যে উৎসবে পাগল হয়ে উঠত সহসা তার তাৎপর্য জেনে ফেললাম আমি। আমিও সে উৎসবে সর্বাঙ্গে মনে জ্বলে উঠলাম। নারী-শরীরের নূতন রহস্য আমাকে অসহ্য করে তুলল। আমি তার বুকের ওপরে বর্ষার রূপ্‌সির দুরন্ত ঢেউ হয়ে আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগলাম। ক্ষণে-ক্ষণে খড়ের আগুনের মতন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠি আমি, জ্বলে ওঠে ওই মেয়েও। মধ্যরাত্রির জ্যোৎস্নার চেয়ে প্রখর আরও রহস্যময় এক মমতার আলো থরথর করতে থাকে মেয়ের মুখে, চোখে জ্বলে জোনাকির দীপ। সে আমার চুল অস্থির আঙুলে এলোমেলো করে দেয়, গালে পিঠে অস্থির হাত বুলোয়। যেন এক অসহ্য পুলকে দুহাতে আমাকে নিংড়ে ফেলতে চায় মেয়ে। আমি তাকে দু বাহুর মধ্যে সাপটে ধরি। শেষে তীব্র উচ্ছ্বাসের পরে নিস্তেজ হয়ে যাই। যেন খড়ের আগুনের মতনই নিমেষে ছাই হই আমি। ক্লান্তি নামে শরীরে, অবসাদে চোখ বুজে আসে; কিন্তু মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে তারপরেই আবার নূতন করে জ্বলে উঠি সর্বাঙ্গে, যেন মেয়ের শরীরে নিঃশেষে প্রবেশের জন্যে নূতন উত্তেজনায় আছড়ে পড়ি তার বুকে। পারি না। যেন সে অক্ষমতার দাহেই ক্লান্তি গ্রাহ্য করি না। অবসাদ উপেক্ষা করি। তবু অবশেষে একেবারে অবসন্ন হয়ে যাই। চোখ জুড়ে রাজ্যের ঘুম নেমে আসে। অসাড় হয়ে পড়ি।

সেই অসাড় ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি, আমি কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে ঘুমিয়ে আছি। আমাকে চারদিক থেকে এক গাঢ় অন্ধকার ও উষ্ণতা ঘিরে আছে। সে অন্ধকারের একটি মাত্র সংকীর্ণ দ্বার। আমি আমার নিজের শরীর দিয়ে সে দ্বার রুদ্ধ করে আছি। ক্রমশ উত্তাপ বাড়ছে। ক্রমশ আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমার ভয় করছে। দারুণ ভয়ে আমি সবলে হাত পা মেলতে চাইছি। কি যেন সশব্দে চৌচির হয়ে গেল। অন্ধকার আর নেই। হুহু করে বাতাস আসছে। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চোখ খুললাম। আকাশে চোখ পড়ল। দু চারটে তারা আছে, কিন্তু সেই রহস্যময় রুপোলী জ্যোৎস্না নেই। সূর্য ওঠার আগেকার নরম আলোয় ভরে উঠছে আকাশ।

বিছানায় চোখ ফিরিয়ে এনে চমকে উঠলাম আমি।

মেয়ে নেই।

অথবা ছিল না। শুধু স্বপ্ন দেখেছি।

বুকটা মুচড়ে উঠল।

ঝাঁপ দিয়ে নেমে পড়লাম মাচা থেকে। জামা প্যাণ্ট পরলাম। ছুটে এলাম শিমুল গাছের নিচে। সেই সানকি গামছা তেমনি পড়ে আছে।

তাহলে? স্বপ্ন কেন হবে?

পাছে বাধা দিই, পাছে সঙ্গে যেতে চাই, ধরে রাখতে চাই। সে পালিয়েছে। হতাশ হলাম না।

যেন জানি পালাবেই। পালাবে। যেন আমার স্বপ্ন সত্য হতে হতে ক্রমাগত স্বপ্ন হয়ে মিলিয়ে যাবে। আর আমি আমার সেই অধরা স্বপ্ন পলাতক সত্যকে গ্রামে গঞ্জে নগরে বন্দরে দেশে দেশান্তরে খুঁজে বেড়াব।

দেখতে দেখতে রুপ্‌সির দূর বাঁকে জবাকুসুম-রক্তবর্ণ সূর্য উঠল। যে সূর্যের মধ্যে আমার মা মিলিয়ে গেছেন, আমি তার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে রইলাম।

আমার মাথার ওপর দিয়ে কতকগুলি বেলেহাঁস পানকৌড়ি কলরব করে উড়ে গেলে চমকে উঠলাম ও সূর্য সম্মুখে রেখে হাঁটতে থাকলাম। পেছনে অরণ্য আমার বাড়ি পুরাতন পৃথিবী পড়ে রইল। কেবল রুপ্‌সি চলল আমার সঙ্গে সঙ্গে।

৩

রুপ্‌সির পাড় ধরে হাঁটছি। পাঠশালা ছুটি হলে তুরন্ত ছেলে যেমন করে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে লাফায়, লাফাতে লাফাতে ছোটে। হাতের স্কেল দিয়ে ঝোপে-ঝাড়ে বাড়ি মারে, গোরু ছাগল সামনে পেলে খোঁচা দেয়। নাগালের মধ্যে পেলে লাফ মেরে ফুল ফলটা পেড়ে আনে। অকারণ খুশীতে শিস দিয়ে ওঠে ক্ষণে-ক্ষণে। তার আনন্দ বোঝা যায়। সে বাড়ি ফিরছে। বাড়িতে তার মা আছে। মা তার জন্যে তুয়োরে দাঁড়িয়ে থাকবে। ছেলেকে বাড়িতে ঢুকতে দেখলে এগিয়ে আসবে। আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম ধুলোবালি মুছে দেবে। মুখের কাছে তুধের বাটি ধরবে।

আমার বাড়ি নেই।. আমার মা নেই। আমার কোন লক্ষ্য নেই সামনে। তবু আমি সেই পাঠশালা-ছুট ছেলের মতনই নিরুদ্বিগ্ন। তার মতনই হাঁটতে হাঁটতে লাফাচ্ছি, লাফাতে লাফাতে ছুটছি। কখন একটা কঞ্চি কুড়িয়ে নিয়েছিলাম হাতে তাই দিয়ে তলোয়ারের মতন ঘুরিয়ে ঝোপ ঝাড়ের মগডাল কচি পাতা উড়িয়ে দিচ্ছি। কখনো বক কিংবা হাড়গিলে দেখলে তাড়া করছি। ক্ষেত পেরিয়ে বন, বন পেরিয়ে ক্ষেত নিশ্চিন্তে হেঁটে চলেছি। কোনো ক্ষেতের ক্ষীরাই খাচ্ছি কোনো ক্ষেতের তরমুজ। কোনো বনের আমের কুশী কোনো বনের বৈচি ফলসা।

যে রক্তবর্ণ সূর্য দেখে ঘুম ভেঙে আমি মুগ্ধ চোখে চেয়েছিলাম সে এখন আকাশের অনেক উঁচুতে উঠেছে। সে এখন আগুন

ছড়াচ্ছে, তার ছোট্ট শুভ্র শরীর এমন এক দীপ্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন যে দেখা যায় না। চোখ তুলে তাকাবে কার সাধ্য। হাহা করে বাতাস বইছিল ও ধুলো উড়ছিল। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে। তবু আমার চলার বিরাম ছিল না। কখনো পায়ের তলায় তপ্তবালি মাথার ওপরে নগ্ন আকাশ, কখনো ভিজে মাটি সবুজ পাতার ছাতা। চলতে চলতে দূরে অদূরে চাষীর কুঁড়ে গৃহস্থের বাড়ি চোখে পড়ছিল। সেই সব ঘর বাড়ি এবং ক্ষেতে মাঠে দু'চার জন মানুষ নজরে পড়ছিল বলেই বুঝি মনের মধ্যে একটা ভরসা ছিল রাত্রির মতন একটা আশ্রয় কোথাও মিলবেই। অথবা যার ঘর নেই পথই তার আশ্রয়, যে-কোন জায়গাই মায়ের কোল ভেবে নিরুদ্বিগ্ন ছিলাম। হয়ত মনের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাও কাজ করছিল, রাত্রি হবার আগেই কোন গ্রামে এসে পৌঁছা চাই। তাই এমন প্রচণ্ড রোদ উপেক্ষা করে হাঁটতে পারছিলাম।

এক সময়ে একটা গোরুর গাড়ি চোখে পড়ল। ক্ষেত থেকে বেশ উঁচু ও চওড়া কাঁচা মাটির রাস্তা ধরে গাড়িটা চলছিল। মনে হল, কোন গঞ্জ কি হাট বেশী দূরে নেই। কিন্তু আর আমি হাঁটতে পারছিলাম না। উত্তাপে ও অবসাদে আমার চোখ বুজে বুজে আসছিল। নদীর উঁচু পাড়ের নিচে খোঁটায় বাঁধা দু'একখানা ডিঙি দেখছিলাম। সরু সরু কয়েকটা পথ বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সাপের মতন এঁকে বেঁকে এসে নদীর দিকে চলে গেছে চোখে পড়ল। আমি এক ভিন্ন গাঁয়ের প্রান্তে এসে পড়েছি বুঝলাম। কিন্তু কোন গৃহস্থ বাড়ি খুঁজে বের করবার উৎসাহ তখন আর আমার নেই। আমি ঘন পাতার ছায়া পেয়ে একটা হিজল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিও না। যখন ঘুম ভাঙল সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই। আকাশে এক ঝাঁক বক উড়ে গেল, একটু পরে আর এক ঝাঁক টিয়ে। চারদিক শান্ত নির্জন। শব্দ নেই। সন্ধ্যার রোদে গাছের মাথা হলুদ হয়েছে। মাটি থেকে

একটা ধূসর ছায়া ক্রমশ উপর দিকে উঠছিল। পিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুকনো। ঢোক গিলতে পারছিলাম না। বুকের মধ্যে থেকে একটা যন্ত্রণা ক্রমাগত সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। কয়েক আঁজলা জল না খেলে যেন আর বাঁচব না। আমি নদীর দিকে এগুচ্ছিলাম।

তখন দেখা তার সঙ্গে।

প্রথমে একমাথা চুল, কপাল, সিঁদুরের ফোঁটা দেখলাম। একটু পরে কাঁখের কলসি চোখে পড়ল। ধীরে ধীরে আমার চোখে সম্পূর্ণ হচ্ছিল মানুষটি। আঁচলটা কোমরে জড়ানো। সরু কাঁকাল কলসির ভারে বাঁকা। ভারি নিতম্ব ও স্থূল উরুতে লেপটে আছে একখানা লাল ডুরে শাড়ি। হাঁটুর অল্প নিচে শাড়ির সবুজ পাড়। পায়ের গোছ সুডৌল শক্ত। আমার চোখ তার সারা অঙ্গ ঘুরে মুখে এসে থেমে রইল। তখন সে নিকটে এসেছে। চোখজোড়া দেখে আমার বুক গুড়গুড় করে উঠল। এ চোখে যেন সবাইর চোখ এসে ধরা পড়েছে, সেই বেদেনীর চোখ, সেই যাযাবরীর চোখ, কালকের দেখা যে-মেয়ে নাম বলতে চায়নি তার চোখ। আমার মা, আন্নামা যেন এর শরীরে এসে এক হয়ে গেছে। আমার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। আমি হাঁটু পেতে বসে দুহাত আঁজলা করে বাড়িয়ে দিলাম। কথা বলতে পারছিলাম না। কেবলই মনে হয়েছে যেন আজকের সেই আলতা-গোলা ভোর থেকে এই সোনালী বিকেলে এসে পৌঁছবার জন্যেই প্রাণপণে শুধু হেঁটেছি। ওর কলসির জলে পিপাসা মিটাব বলেই যেন কোথাও এক ফোঁটা জল ঠোঁটে ছোঁয়াইনি। আমার সর্বাঙ্গে যে এত পিপাসা সে যেন এই কলসির জলে তৃপ্ত হবার জন্যেই বুকের মধ্যে এসে ছট্‌ফট্ করছিল।

সে আমার সামনে এসে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অনিশ্চিত বিহ্বল ভাব, যেন কি করতে হবে বুঝে উঠতে দেরি হচ্ছিল। সে-অনিশ্চিত বিহ্বল দু'পলক কেটে যেতেই সে কাঁখের

কলসি মাটিতে রাখল। আমাকে হাত ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

'কে তুমি, কোথা থেকে আসছ ?'···

ভ্রূ কুঁচকে গেছে, গালের পেশী চোয়াল শক্ত হয়েছে, যেন আমার ওপরেই তার রাগ, কিন্তু না, সে কোমর থেকে আঁচল খুলে আমার কপাল গাল গলা মুছে দিতে লাগল।

···'রোদে পুড়ে মুখখানা ঝরা পাতার মতন শুকিয়ে গেছে, তুমি সারা দিনটাই রোদের মধ্যে হেঁটেছ, তোমাকে কি কুকুর তাড়া করেছিল ? নাকি শত্রুপুরী থেকে পালিয়েছ ? বাপ মা নেই, না সব খেয়ে বসে আছ ? তুমি যাচ্ছ কোথায় ? কোন রাজকার্যে ডাক পড়েছে !···মুছব কি সারা গায়েই যে ধুলো ! সারা পথ কি ধুলোয় গড়াতে গড়াতে এসেছ ?···'

মুখ মোছা হয়ে গেলে সে আমার হাত মুছছিল, আর ক্রমাগত বকে যাচ্ছিল। জানি এর কোন উত্তর নেই, সে উত্তর চায়ও না। আমি চুপ করেছিলাম। আমের কষে ক্ষীরাইয়ের রসে ধুলোয় ঘামে হাত কাদায় আঁটায় মাখামাখি। শুকনো আঁচলের ঘষায় পরিষ্কার হচ্ছে না।

'এ হাতে জল খাবে কি করে, কি করেছ হাতখানাকে ! না, এখন জল খেতে হবে না, এখন জল দেব না।'

সে কলসিটা কাঁখে তুলে নিল। আমি হাসলাম। সামনে নদী। ঠাণ্ডা পরিষ্কার জল। তুমি নাই বা দিলে। আমি নদীর দিকে যাব বলে মুখ ফিরিয়েছি, সে খপ করে আমার হাতটা ধরল।

'অমনি রাগ। বাব্বা বাব্বা, কি রাগ, কি রাগ, একদুপুর রোদে পোড়া-পোড়া হয়েও তেজ মজেনি। হুঁ এস, দেখি, তোমার কত তেজ।'

সে সেই সরু পথগুলির একটার ওপর দিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চলল। তার হাতের মুঠোর ভিতর থেকে এক আশ্চর্য

মমতা আমার শিরার রক্তে এসে জলে দুধের মতন মিশে যাচ্ছিল। আমার অবসন্ন পিপাসার্ত শরীরে সে বল সঞ্চার করছিল আস্তে আস্তে। উঁচু উঁচু গাছের ডাল পাতার নিচে ছোট্ট উঠোনটা অন্ধকার হয়ে উঠেছে, তারই মাঝখানটায় আমাকে দাঁড় করিয়ে বলল, 'দাঁড়াও পালাবে না যেন। আমি আসছি।'

'কে রে পদ্ম, কার সঙ্গে কথা বলছিস?'

'সে কি আর আমি জানি যে বলব? এই ভর সন্ধ্যেয় একটা কুকুর বাড়িতে ঢুকলে গেরস্ত তাড়ায় না, আর সে কিনা জল খেতে চেয়ে চলে যাচ্ছিল। আমি ধরে নিয়ে এসেছি! যাক দেখি এখন গেরস্ত বাড়ি থেকে না খেয়ে।'

আমি শুনছিলাম আর হাসছিলাম ও সদ্য শোনা তার নামটিকে মনের মধ্যে আওড়াচ্ছিলাম। সত্যি অমন ঢলঢলে যার মুখ পদ্ম নামটিই তার যথার্থ মানায়। ইচ্ছে হচ্ছিল দু'হাতের আঁজলায় ওর মুখখানা তুলে ধরে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। যেন ক্ষুধায় নয়, পিপাসায় না কেবল ওই চোখজোড়া দেখবার ইচ্ছায় আমার সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপছিল।

পদ্ম এক হাতে একটু গুড় আর এক হাতে এক গ্লাস জল নিয়ে এল, 'নাও গুড়টুকু মুখে ফেলে জলটা খেয়ে নাও। আমি সন্ধ্যে-বাতিটা দিয়ে আসছি।'

পদ্ম ঘরের বাতি জ্বালল, ঘর থেকে জ্বালিয়ে হাতের কোষে ঢেকে তুলসীতলার বাতি নিয়ে বাইরে এল।

আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে বলল, 'জল খেয়েই পালাওনিত, পালালে এ গাঁয়ের সব কুকুর লেলিয়ে দিতাম। না খেয়ে গেরস্ত বাড়ি থেকে পালানর মজা টের পেতে।'

সে তুলসীতলায় বাতি দিল, প্রণাম করল, শেষে এসে আমার হাত ধরল। তার হাতে কাপড় গামছা, একখানা সাবান। বলল, 'চল নদীতে চান করবে।'

এখানে আকাশ নদী চরাচর জুড়ে কনে-দেখা আলো। সে-আলোয় পদ্মকে আমি আর একবার দেখলাম।

'কি দেখছ?' পদ্ম হাসে।

'পালাতে চাইলে যে কুকুর লেলিয়ে দেবে বলে শাসন করে তার মুখখানা।' আমি জামা খুলে পদ্মর পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে জলে ঝাঁপ দিলাম।

পদ্ম চেঁচিয়ে বলল, 'প্যাণ্টটাও খুলে দাও। তুমি চান করতে করতে আমি একটু সাবান বুলিয়ে কেচে দিই। যা নোংরা করেছ। ধর।' বলে সে গামছাটা ছুঁড়ে দিল।

আমি গামছা পরে প্যাণ্ট দিলাম তাকে। সারাদিনের রোদে পোড়া শরীর নদীর জলে ডুবে নিমেষে সরস সতেজ হয়ে উঠল। আমি খুশীতে সাঁতার কাটতে সুরু করেছিলাম।

পাড় থেকে চিৎকার করে উঠল পদ্ম, 'এ ভর সন্ধ্যেয় ডুবুডুবি করতে হবে না, উঠে এস।'

আমি জল থেকে উঠে এলাম। পদ্মর ধমকে না। সাঁতার কাটতে গিয়ে নূতন করে টের পেয়েছি, আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত।

পাড়ে উঠতেই পদ্ম আমার পায়ে হাঁটুতে, সারা গায়ে, সাবান লাগাতে সুরু করল।

'ওকি হচ্ছে?' আমি সরে যাচ্ছিলাম।

পদ্ম ধরে রাখল। 'একহাঁটু ধুলো পায়ে, গায়ে মাথায় চটচটে ঘাম, ভেবেছ জলে ভিজলেই ধুয়ে উঠে যায়?'

আমার সর্বাঙ্গে সাবান মেখে দিতে দিতে বলল, 'এ সানলাইট সাবান, কাচাকুচিও চলে গায়ে মাখাও চলে, গা চড়চড় করে না।···নাও, এবার চট করে হুটো ডুব দিয়ে ওঠ, দেখো শরীর কেমন ফুরফুরে লাগবে।'

তাই লাগছিল। পদ্মর পিছন পিছন ফিরছিলাম। সন্ধ্যার নরম ঠাণ্ডাবাতাস গায়ে লাগছিল আর মনে হচ্ছিল যেন কেউ

পাখির পালক বুলিয়ে দিচ্ছে গায়ে। আরামে চোখ বুজে আসছিল। হয়ত অবসাদে।

'খুব ক্ষিধে পেয়েছে, না?'

'কেন ক্ষিধে পাবে? সারাদিন কত কি খেয়েছি—ক্ষীরাই তরমুজ আমের কুশী বৈচি ফলসা...'

'এ সব খেয়ে মানুষের পেট ভরে কখনো?' পদ্ম আমার পেটে হাত দিল। 'মিথ্যাবাদী কোথাকার, পেটেপিঠে এক হয়ে গেছে, তবু বলে কিনা পেট ভরা।' পদ্ম আমার গাল টিপে দিল।

বললাম, 'ক্ষিধে পায়নি তা নয়, কিন্তু তার চেয়ে বেশী পেয়েছে ঘুম। খেতে চাইনে, শুধু একটু শুতে চাই এখন। শুতে পেলে বাঁচি।'

'পাবে গো, পাবে। খেতেও পাবে, শুতেও পাবে।'

হাঁড়ির সব ভাত উজাড় করে পদ্ম আমায় বেড়ে দিয়েছে। হেঁসেলের সব ডাল তরকারি মাছের ঝোল আমার থালার সামনে বাটিতে বাটিতে সাজানো।

বললাম, 'এত কে খাবে? নিজের জন্যে কিছু না রেখে আমাকে সব দিয়ে দিলে কেন?'

'কে বললে নিজের জন্যে রাখিনি?'

'দেখলাম ত নিজের চোখে।'

'ব্যাটাছেলের এত হাঁড়ির দিকে নজর থাকবে কেন? নাও খেতে শুরু কর। সারাদিন কিছু খাওনি, এ ক'টা ভাতে হয়ত পেটও ভরবে না।'

আমি তবু ভাতে হাত দিচ্ছি না দেখে সে নিজেই ভাত ভেঙে ডাল ঢালল। এক গ্রাস মেখে মুখের সামনে ধরে বলল, 'আহা, নাগর আমার, না খাইয়ে দিলে খাবেন না।'

আমি হাত ঠেলে দিলাম। 'তুমি না খেলে আমি ভাত মুখে তুলব না।'

অগত্যা সে খেতে রাজি হল।

খেতে খেতে গল্প করছিল পদ্ম।

ওর বাবার এখন তেলকলে রাতের ডিউটি, একমাস চলবে তারপরে দিনে। দিন বারোটা থেকে রাত আটটা। মার রক্ত আমাশয় হল, বাবার কষ্টের আর সীমা ছিল না। দুঃখ করে চিঠি লিখেছিল বাবা, তাদের দেখবার কেউ নেই। "আমার ভাই শ্রীদাম নসিমপুরে চাকরি করে। বউ নিয়ে আছে সেখানে। অথচ এই তেলকলেই ভাল চাকরি হয়েছিল। কিন্তু বউকে যে তা হলে গোরুর দানা-পানি যোগাতে হবে, গোবর দিয়ে উঠোন নিকোতে হবে, শহুরে বউয়ের তাতে বড় ঘেন্না। চিঠি পেয়েই আমি চলে এলাম। সোয়ামীর তাতে কি রাগ, 'তুমি ত নাচতে নাচতে বাপকে দেখতে যাচ্ছ, আমাকে দেখবে কে?' মনে মনে বলেছি, যম?" বলে হেসে কুটিপাটি হয় পদ্ম।

আমারও হাসি পায়।

শুধোই, 'কেন?'

হাসি তখনও ওর ঠোঁটে গালে চোখের কোণায় ঢেউ খাচ্ছে, বলল, "আমার সোয়ামীকে দেখলে তুমিও বলতে। শুকনো আদার মতন চেহারা। যেন হাড়গিলে। পঞ্চাশ বছর ত আমাদের ন'কড়িরও, আমাদের ক্ষেত-মজুর গো, কিন্তু কি ঘাড়ে-গর্দানে মানুষটা। খাটতে পারে কী দিন রাত, একটা দেড়মনি বোঝা দু'মাইল মাথায় করে নিয়েও হাঁপায় না। আর আমার সোয়ামী ঘরে বসে হাঁপায়। হাঁপানীর রোগী গো। বাপ দেখে-শুনে বিয়ে দিয়েছে। পণ লাগেনি এক কাহনও, উল্‌টে গা-ভরে গয়নাগাটি পরিয়ে বিয়ে করে নিয়ে গেছে। জমি-জিরাত আছে তার ওপরে তেজারতি ব্যবসা। বাবা বললে,

'রানীর হালে থাকবি'। সেই রানীর হালেই আছি। দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী বউ, চোখের আড়াল হলে অন্ধকার দেখে সোয়ামী। অথচ মুরদ নেই। মানুষটা ভাবে শুধু টাকাকড়ি গয়নাগাটিতেই যেন মেয়ে মানুষের মন ভরে। পেট-রোগা লোকের যেমন হজম করার সামর্থ্য নেই একরত্তি কিন্তু খাবার দেখলেই খাই-খাই করে ওঠে, ওরও সেই দশা। হাতের কাছে আমাকে পেলেই"...কি একটা দৃশ্য ভেবে পদ্ম হেসে লুটিয়ে পড়ে। শেষে উঠে বসে ধমক দেয়, 'তুমি খাবে না, শুধু গল্প শুনবে?'

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। পদ্ম আমার থুতনি নেড়ে দিয়ে বলল, 'আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেই কি পেট ভরবে?' সে একটা গ্রাস আমার মুখে পুরে দিল, 'খাও।'

আমি খেয়ে উঠে মুখ হাত ধুয়ে একটু ঘুরে এসে দেখি পদ্ম রান্নাঘর নিকিয়েছে। বিছানা পেতেছে। এখন মশারি খাটাচ্ছে।

বললে, 'এবার শুয়ে পড়, একা ঘুম আসবে ত?'

পদ্ম আমার চোখে চোখ রেখেছে অনেকবার। আবার রাখল। আমিও। ও আমার চোখে কি দেখে জানিনে, আমি আবারকরে দেখলাম সবাইকে ওর চোখে। আমার মা, আন্নামা, বেদেনী, যাযাবরী, পর্যন্ত কাল রাতের সেই নাম না-জানা মেয়ের চোখ। পদ্মর মধ্যে যেন সবাই এসে ভীড় করেছে। আমার ইচ্ছে করছিল, দু'হাতের মধ্যে ওর মুখখানা তুলে ধরি, ভাল করে দেখি চোখ জোড়া।

পদ্ম সে সুযোগ না দিয়ে চলে গেল। ওর মা ডাকছিল। কুপিটা জ্বলছিল এক পাশে। আমি নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম এবং শুতে শুতে অগাধ ঘুমের মধ্যে ডুবে গেলাম।

রাত তখন কত জানিনে, উজ্জ্বল আলো গরম নিঃশ্বাস ও

বুকের ওপরে এক-বোঝা ভার আমার ঘুম ভেঙে দিল। চোখ মেলে দেখি, পদ্মর মুখ আমার মুখের ওপরে। তার আধখানা শরীর আমাকে ঢেকে আছে।

ফিসফিসিয়ে বলল, 'তোমাকে নিয়ে আমার বিবাগী হতে ইচ্ছে করে।'

পদ্ম ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিল। আমার হঠাৎ দেখা ক্ষণকালের সত্য স্বপ্ন হয়ে উঠল। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, আমি পদ্মার শরীর খুঁড়ে খুঁড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তবু তার শরীরের মধ্যে মিলিয়ে যেতে পারছি না। আমি নিঃসঙ্গ। আমি কিছুতে কোন শরীরে আশ্রয় পাব না। আমি অবশেষে অবসাদে হতাশায় তলিয়ে গেলাম।

আমার শুকনো ঠোঁটে ভিজে ঠোঁটের ছোঁয়া লাগল। আমি চোখ মেলে দেখি ভোর হয়েছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে খড়খড়ি দিয়ে নীল জলের মতন আলো এসে ভরে দিয়েছে, ভরে দিচ্ছে ঘর। পদ্ম আমার শিয়রে বসা। ইতিমধ্যেই তার স্নান সারা। তার ভিজে চুল কাঁধে পিঠে ছড়ানো, জুলপি বেয়ে জল গড়াচ্ছে টুপটুপ করে। কপালে সদ্য আঁকা সিঁদুরের ফোঁটাটা জ্বলজ্বল করছে।

পদ্ম আমার চোখে চোখ পেতে বলল, 'নাগর ওঠো, এবার তোমার চলে যাবার সময় হয়েছে।'

জানি আমি থাকতে আসিনি। আমি চলে যাব। তবু বুকটা মুচড়ে উঠে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

পদ্ম বলল, 'বাবা কাজ থেকে ফিরেছে, আমার সোয়ামী তার কাছে খবর পাঠিয়েছে, আজ আমাকে সে নিতে আসবে। বলেছি না, লোকটার ভীমরতি। একটা মাস কাটতে দিলে না। এর মধ্যে দু'বার তাগাদা পাঠিয়েছে চলে যাবার জন্যে,

এবার তিনি নিজে আসছেন। একলা থাকতে তার কষ্ট। আমার যে সেখানে কী সুখ একবারও ভাবে না মানুষটা। আমার ঘেন্না করে।'

পদ্মর মনের ঘৃণা তার চোখে মুখে একটা বিকৃত ছবি আঁকল।

তবু এরই মধ্যে সে স্নান করেছে, সিঁদুর পরেছে, সে যাবার জন্যে তৈরি।

বললাম, 'ঘৃণাই যদি কর গিয়ে কাজ কি, তার চেয়ে চল না, দু'জনে যেদিকে চোখ যায় বেরিয়ে পড়ি।'

পদ্ম নুয়ে পড়ে একটা চুমু খেয়ে বলল, 'ওখানে সুখ পাব না জানি, কিন্তু আশ্রয় আছে। তুমি আমাকে সোহাগ করে কোথায় নিয়ে রাখবে শুনি ?'

আমি আর বললাম না, কাল রাতে তুমি বলেছিলে, আমাকে নিয়ে তোমার বিবাগী হতে ইচ্ছে করে। আসলে নারী সুখ নিতে পারে, পাথেয় দিতে পারে কিন্তু সঙ্গী হতে পারে না। যত বড় নড়বড়েই হোক তারা একটা আশ্রয় চায়। তার মায়ের মতন নারী ক'জন !

সুভদ্রাও চেয়েছিল একটি নীড় বাঁধতে। সোহাগের কাঙাল নারী ভাশুরের সংসারে দাসীবৃত্তি করত। স্বামী একটা খুনের মামলায় আসামী হয়ে জেল খাটছে, কবে ছাড়া পাবে সুভদ্রা জানত না।

আমি জিরোবার জন্যে একটা পুকুরপাড়ে আমলকী গাছের নিচে বসেছিলাম। ঘাটে কলসি রেখে সে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখে আমিও উঠে দাঁড়িয়েছি। সে আমার থুতনি ধরে আমার মুখ উঁচু করল। সে আমার চোখে চোখ

রাখল একটু কাল। হাত নামিয়ে মৃদু একটু হাসল, বলল, 'ভিখিরী নও, সন্ন্যাসী না। বাউণ্ডুলে? চোখ দেখে মনে হয় স্বপ্ন দেখছ! ক্ষিধে পায়নি?'

আমি মাথা কাত করে জানালাম, 'পেয়েছে।'

সে আবার হাসল। 'বোকা, তবে এখানে বসে আছ কেন? ওই যে কীর্তন হচ্ছে, খোল কর্তালের বাজনা শুনছ না? ওখানে যাও। মচ্ছোব হচ্ছে। খিঁচুড়ি পায়েস পেটভরে খাওয়াবে।'

'তুমি যাওনি কেন?'

'আমি গেলে বাড়ি পাহারা দেবে কে?'

'বাড়ির সবাই বুঝি প্রসাদ পেতে গেছে?'

'হাঁ, কেউ কীর্তন গাইবে, কেউ শুনবে। দুপুরে খাবে, রাতে খাবে তবে আসবে।'

'তুমি কি খাবে?'

'ভেবেছিলাম কিছু খাব না, কিন্তু খিঁচুড়ি পায়েস ফেলে কি ভাতে-ভাত রুচবে? রোচে ত এস।'

ডেকে এনে সুভদ্রা তার জীবনের দুঃখ বলেছিল।

সে আমাকে একটা পড়ো বাড়ির ভাঙা তক্তপোশে মাদুর বিছিয়ে দিয়েছিল শুতে। সেও এসে শুয়েছিল মধ্য রাতে। আমাকে সে তার শরীরের অন্তর্ভুক্ত করে তার বুভুক্ষু জীবনের স্বপ্নের কথা বলেছে। তার কিছু টাকা আছে। কিছু গহনা। বাপের ছাড়া-ভিটে আর কিছু জমিজমা আছে। আমাকে নিয়ে সে নীড় বাঁধতে চায়।

কাক ডাকবার আগেই সে আমাকে টেনে তুলল। 'ওঠো, পালাই।'

সুভদ্রা আমাকে নিয়ে কখনো হেঁটে কখনো নৌকোয় শেষে গোরুর গাঁড়িতে এসে তার বাপের দেশে পৌঁছল। ছোট্ট

একটি গাঁ। গাঁয়ে মানুষ-জন বাড়ি-ঘরের থেকে ডোবা-জঙ্গল গাছ-গাছালি বেশি। বাড়িগুলিও অধিকাংশই আগাছায় ভরা। ঘরগুলিও জীর্ণ। কোনটার চালে খড় নেই কোনটার বেড়াগুলি বহু বর্ষার জল খেয়ে-খেয়ে ক্ষয়ে পচে গেছে, কোনটা হেলে-বেঁকে আছে—পড়ো-পড়ো অবস্থা। তারই মধ্যে কোনমতে গৃহস্থালী মানুষের। খেটে-খাওয়া মানুষগুলির চেহারাও গ্রামটির মতন শ্রীহীন।

সুভদ্রার ঘরদোর সে পরিবেশে তাই খুব বে-মানান মনে হল না। তার মা মারা গেছে অনেকদিন। বাপ কবে যেন কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেছে। নিরুদ্দেশ।

বন-তুলসী ভাটগাছ আঁশ-শেওড়ার জঙ্গল পার হয়ে সুভদ্রা তার হেলে-পড়া ঘরের দাওয়ায় উঠে যখন দাঁড়াল তার চোখে জল। সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদল কতক্ষণ। শেষে কান্না মাখা চোখে আমার চোখ দেখতে দেখতে বলল, 'তোমাকে নিয়ে আমি নূতন করে ঘর বাঁধব। আমাকে ছেড়ে যাবে না ত তুমি?'

আমি সুভদ্রার চোখে সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখছিলাম। স্নেহের মমতার সোহাগের। আমি যা কখনো পাইনি সে-যেন ওই দৃষ্টির প্রদীপে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল আমার চোখে। আমি একজনের চোখভরা স্নেহ বুকভরা মমতা সর্বাঙ্গ জুড়ে আদর দুহাতের অঞ্জলি ভরে ভোগ করব চিন্তা করে প্রসন্ন হয়ে উঠেছিলাম।

সুভদ্রা তার ঘরের মেঝের উইয়ের ঢিপি ভাঙল, ইঁদুরের গর্ত বোজাল, গোবর জলে ঘর নিকিয়ে ঝকঝকে করল। আমি ঘরের বাদুড় চামচিকে তাড়ালাম, মাকড়সার জাল ঝাড়লাম, পাখির বাসা ভাঙলাম, এখানে ওখানে ঠেকা দিলাম, ঘরটি বাসের যোগ্য হল। সুভদ্রা উঠোনের জঙ্গল সাফ করেছে। পুকুরে ঘাট পেতেছে। দু'জনে আমরা বাজারে গিয়ে নুন লঙ্কা

চাল ডাল তেল মশলা কিনেছি। অল্পে অল্পে হাঁড়ি কড়াই কলাই-করা বাসন-কোশন কেনা হয়েছে। সুভদ্রার সংসার পূর্ণ হয়ে উঠতে দেরি হয়নি। কিন্তু ওর বাবার সামান্য যে জমিটুকু বর্গাদারের মুঠোয় চলে গিয়েছে তা উদ্ধার করতে আমার শক্তি ছিল না। সাহায্যের হাত বাড়াল নীলাম্বর দাস। সুভদ্রার বয়সের দ্বিগুণ হবে তার বয়স হয়ত আরও বেশি—পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন। পদ্মর স্বামীর মতন শুকনো আদা নয় কিন্তু দারিদ্র্যজীর্ণ—খেটে খাওয়া মানুষ তাই শক্ত সমর্থ। সুভদ্রার তাকে প্রয়োজন ছিল। আমাকে দিয়ে তার হৃদয়ের দাবি মিটছিল। দৈনন্দিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকার নিত্য-প্রয়োজনের দাবি মেটাতে সে নীলাম্বর দাসকে চাইছিল। সুভদ্রা সে-প্রয়োজনের দিকে যত এগোচ্ছিল আমি তত বন্ধনমুক্ত হচ্ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, সে নীড় চায়। নীড় থাকলে আমি না থাকলেও চলবে।

একদিন সুভদ্রাকে সেই প্রয়োজনের হাতে তুলে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লাম। আমার মা সহস্র জোড়া চোখে ছড়িয়ে আছে। আমি সুভদ্রার এক জোড়া চোখে তার সবটুকু পাব কেন! প্রয়োজনের কাছে সুভদ্রা অন্ধ হয়ে আসছিল ক্রমশ। অতএব সে-জোড়া চোখের রহস্যের সামান্যটুকুও যখন মলিন হয়ে এল আমি আর থাকতে পারিনি। সুভদ্রা তার বুকের সোহাগ-বাতি নিবিয়ে দিয়ে প্রয়োজনের আঁচে শরীর ঝলসাবে, ওর সে দুঃখ দেখতে আমি থাকব কেন?

কাক-ভোরে উঠে সুভদ্রা রান্না করেছে। রান্না সেরে আমাকে তুলে দিয়েছে। 'ঘাটে কাপড় গামছা রেখে এসেছি, চান করে দুটি খেয়ে নাও।'

'এত সকালে খাওয়া যায় না।' আমি আপত্তি করেছি, সুভদ্রা শোনেনি, জোর করে খাইয়েছে। আমাকে সদরে পাঠাতে তার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু নীলাম্বরকে সে বিশ্বাস করে না।

পাছে টাকা-পয়সা তছরুপ করে! প্রয়োজনের অধিক তাকে প্রশ্রয় দিতে রাজি নয় সুভদ্রা। ওর অন্তরের দ্বন্দ্ব আমাকে পীড়িত করত।

নীলাম্বরের হাতে বাড়তি কিছু টাকা দিয়ে বলেছে, 'ওর জন্যে একটা ছাতা কিনো। তোমার শক্ত মাথা রোদে কিছু হবে না। ওর কষ্ট হবে। হয়ত অসুখ-বিসুখ করবে।'

তিন ক্রোশ পথ আমি হেঁটে যাব হেঁটে আসব ভেবে ওর মুখে কষ্ট ফুটেছে, আমি মনে মনে হেসেছি। রওনা হবার সময় সুভদ্রা বারবার দুর্গা নাম স্মরণ করেছে। পইপই করে বলেছে, 'পিপাসা পেলেই জল খেও না, ঠাণ্ডায় বসে একটু জিরিয়ে নিও। ক্ষুধা পাবে খুব। তুমি মিষ্টি খেও। কাচারি-পাড়ার হোটেল শুনেছি বড় নোংরা, না খেয়ে পারলে ভাত খেও না।'

নীলাম্বর দাস ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেছে, 'কই আমাকে ত কিছু বলছ না।'

আমি দেখেছি, চোখ জ্বলে উঠেছে সুভদ্রার। বলেছে, 'তুমি কি কচি খোকা, মরার-বয়েস হয়েছে, খেয়ে যদি মরতে চাও মরো। আদিখ্যেতা।' বলে সুভদ্রা নাক কুঁচকেছে।

সদরে এসে আমি নীলাম্বরের সঙ্গে কাচারি-পাড়ার হোটেলে পেট পুরে ভাত খেয়েছি। নীলাম্বর ঠাট্টা করেছিল, (জানি ঈর্ষায় মরত লোকটা), বলেছিল, 'সুভদ্রার মনের-মানুষ তুমি, হোটেলে খেয়ে যদি এমনতেমন হয় আমার কপালে ঝ্যাঁটা পড়বে। এস, তোমাকে ভাল ময়রার খাঁটি মিঠাই-মণ্ডা খাওয়াই।'

আমি বলেছি, 'তুমি তার প্রয়োজনের মানুষ, ঝ্যাঁটা মারলে তুমি থাকবে না সুভদ্রা জানে, তাই ভয় নেই তোমার।' ওকে আমি হোটেলে টেনে নিয়ে এসেছি।

খাওয়া হলে সরকারি কুঠীর ঝাউতলার ছায়ায় বসিয়ে দিয়ে নীলাম্বর বলল, 'তুমি এখানে জিরোও, আমি কোর্ট কাচারি সেরে আসি।'

আমি বললাম, আমি আর জিরোব না নীলাম্বরদা, আমি চলি।'

'কোথায় ?'

আমি জেলাবোর্ডের উঁচু রাস্তাটা দেখিয়ে দিলাম।

'কিন্তু সুভদ্রা যে ভেঙে পড়বে।'

'আবার তোমার কাঁধে ভর করে দাঁড়াবে।'

'তোমার হাত ধরে শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে বাপের ভিটেয় এসে উঠেছে, সে ত তোমাকে ভালবাসার জন্যে। তোমাকে হারালে সে'......

'মরবে না। ভাল বাঁচবার জন্যে তোমার হাত ধরবে।'

'আমি কোনদিন তার মন পাব না, আমি ষড়যন্ত্র করে তোমাকে তাড়িয়েছি ভেবে সে আমাকে নিত্য ঘৃণা করবে।'

আমি জবাব দিলাম না। আমি মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে থাকলাম। মনে মনে বললাম, তার জীবনের একদিকে যেমন ঘৃণা অন্ধকার হয়ে জমবে আর একদিকে তেমনি হারানো সোহাগ আলো হয়ে জ্বলবে। আমার জন্যে সে তার চোখে দৃষ্টি-প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবে।

মনে হল যেন আমার মায়ের এক জোড়া চোখ সহস্র জোড়া হয়ে আমার চলার পথের ধারে ধারে জ্বলে উঠছে, সে আলোতে পথ দেখে দেখে আমি এগিয়ে চলেছি। তাই চিরদিন কারো কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকার আগ্রহ যেমন আমার নেই, কাউকে ছেড়ে যেতেও তেমনি আমার কোন কষ্ট নেই। আমার ভয়ডরও নেই। আমি নিঃশঙ্ক, নিশ্চিন্ত।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময়ে জেলা বোর্ডের রাস্তা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সরকারি ইচ্ছা শেষ হলেই মানুষের প্রয়োজন থামে না। গৃহস্থের প্রয়োজন ও মর্জি মতন তার আয়তন ও উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়ে হয়ে কখনো গাঁয়ের ভেতর দিয়ে, কখনো নদীর ধার দিয়ে কখনো কারো উঠোনের ওপর দিয়ে দূরে দূরান্তে

চলে যায়। পথের কখনো শেষ নেই। পথ কখনো থামে না। আমি মাঝে মাঝে থামি। থামতে থামতে চলি।

চলতে চলতে একদিন এক গৃহস্থ বাড়ির ছাঁচ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হেঁসেলের গন্ধে অভুক্ত পেট গুলিয়ে উঠল বুঝি, দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম যেন। একটি বুড়ো মানুষ হাত তুলে ইশারা করলেন। পথ ছেড়ে উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। বেতের তারে ভিজে কাপড় মেলে দিতে দিতে তিনি গুনগুন করে কৃষ্ণের শতনাম জপছিলেন। কাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'বাড়ির ওপর দিয়ে এই ভর দুপুরে একটি অভুক্ত মানুষ চলে যাচ্ছিল, ডেকে এনেছি।'

'আমি ভাবি কত বড় মানুষ যেন।' এক-গলা ঘোমটা ছিল, ফেলে দিয়ে হাসলেন বৃদ্ধা। বললেন, 'ও ছেলে এই এক-গা ধুলো নিয়ে তুমি খাবে কেমন করে? নাকি তাতে তৃপ্তি পাবে? যাও, স্নান করে এস।' তেল গামছা দিলেন।

পরিতুষ্ট করে খাওয়ালেন। যতক্ষণ খেয়েছি সামনে বসেছিলেন। উচ্ছে-ভাজা, ঘি, ডাল দু' রকমের, তরকারি শেষে পাটালি-গুড় আর দুধ একবাটি। নিরামিষ। এমন পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন যেন পুজোর প্রসাদ খেলাম।

'পেট ভরল ত বাবা?' বৃদ্ধার আন্তরিকতায় চোখ ছলছল করে উঠেছে আমার। আমি ঘাড় কাত করেছি।

দাওয়ায় শীতলপাটি বিছিয়ে দিলেন। 'অনেক দূরে যাবে বুঝি বাবা, একটু বিশ্রাম কর। আমি বেলা থাকতে ডেকে দেব।'

ডেকে দিয়েছেন আর ন্যাকড়ার পুঁটলিতে করে কিছু চিড়ে আর পাটালি। যখন সামনে বসে খাওয়াচ্ছিলেন তখনও বারবার আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। এখনও তাকাচ্ছেন। বললেন, 'ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরো না বাবা, মায়ের ছেলে মায়ের

কোলে ফিরে যাও। সে অভাগীর হয়ত চোখের ঘুম উপে গেছে, মুখে ভাত রুচছে না, কেঁদে কেঁদে কাণা হয়ে গেল বুঝি।'

আমার গলা দিয়ে একটা অক্ষর চিৎকার হয়ে উঠতে চেয়েছিল, আমি গিলে ফেললাম। অক্ষরটা বুকের রক্তে আছড়ে পড়ে শিরায় শিরায় ঢেউ হয়ে ছুটল। আমি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে তাঁর পায়ে হাত রাখলাম। তিনি আমাব মাথায় হাত রাখলেন।

গ্রাম ছাড়িয়ে আর এক গ্রামে এসে পথটা শেষে মাঠের মধ্যে নেমে গেছে। ধু ধু বিশাল মাঠ। তারার আলোয় ধূসর দেখাচ্ছে। আমার চারধারে গাছ-গাছালির ছায়ায় জাম রঙের অন্ধকার।

চিড়ের পুঁটলি তেম্নি হাতে ধরা। ক্ষিধে নয় ঘুম পেয়েছিল। আমি খুঁজে পেতে পথের ধারে একটা মাচা পেলাম। খড়ের গাদা ছিল, মাঝখানের উঁচু খোঁটাটা দেখে মনে হল, গৃহস্থ ওগুলি সরিয়ে নিয়েছে কি বেচে দিয়েছে। আমি মাচায় উঠে চিড়ার পুঁটলি মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাত কত কে জানে। একটা আলোর শিখা চোখে পড়তে ঘুম ভেঙে গেল। সেই পাকা জামের মতন অন্ধকার আর নেই। ফুটফুটে জ্যোৎস্না শিউলি ফুলের মতন ছড়িয়ে আছে চারধারে। কেরসিনের শিখাটা থরথর করে কাঁপছিল। আমার মুখের ওপরে একখানি মুখ নত হয়ে আছে। সে-এলোমেলো আলোর শিখা সে মুখে পড়ে মুখখানিকে অলৌকিক করে তুলেছিল। এ কার মুখ? আমি ঘুরে ফিরে আবার সুভদ্রার কাছে এসেছি, নাকি পদ্মর কাছে, অথবা এ সেই শিমুল তলার স্বপ্ন?…না কোন একখানি নির্দিষ্ট মুখ যেন নয়, আমার পদ-যাত্রার পথে পথে যত মুখ দেখেছি যেন সে-সমস্ত মুখের আদল মিলে-মিশে এখন আমার সামনে একখানি মুখ হয়ে ফুটে উঠেছে।

আমি উঠে বসতে যাচ্ছিলাম, সে বাধা দিল।

'উঠো না, শুয়ে থাক।'

সে সরে গেল। তু একটা ঝোপ-ঝোপ গাছের পরে হঠাৎ আলো এবং ছায়া একসঙ্গে অদৃশ্য হল। একজন রুগ্ন আঁতুর মানুষের কাতর শব্দ ও কথাবার্তা কানে এল একটু পরে কিছুক্ষণ। শেষে সব চুপচাপ। আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে যাওয়ার পরে জ্যোৎস্নার মধ্যে একটা ছায়ামূর্তি জেগে উঠল। নিকটে এল। শুয়ে পড়ল আমার পাশে।

কতকগুলি পাখি কিচির-মিচির করছিল। কাক ডাকছিল। চোখ মেলে দেখি আমার কাছাকাছি একটা তালগাছে কয়েকটা বাবুইয়ের বাসা। বাবুইগুলি ওড়াওড়ি করছে, ডাকাডাকি করছে। সূর্য উঠেছে। আকাশে সোনালী আভা। কিছু হলুদ আলো এসে পড়েছে আমার মাচায়। উঠে বসেছি। চারদিকের নির্জনতা দেখছিলাম। মনে হল কাল সারারাত স্বপ্ন দেখেছি। একটি যুবতী বউ গোরু বের করে নিয়ে যেতে যেতে হাসল।

বললে, 'ঘুম ভেঙেছে দেখছি, তবে উঠে এস। মুখ হাত ধোও। তুধ দোয়ানো হয়ে গেছে। খেতে দেব।' তবু মনে হল না, কাল রাতে যে অলৌকিককে দেখেছি সে স্বপ্ন নয়, সত্য।

আমি ওকে চিড়ে পাটালির পুঁটলিটা দিলাম। ও আমাকে তুধের বাটি বাড়িয়ে দিল।

তু'জনে গল্প করছিলাম দাওয়ায় বসে।

ওর নাম নয়নতারা। স্বামী দূরের এক বড় শহরের কারখানায় চাকরি করতে গেছে। সেখানে সে তার নিজের জন্যে সেবাদাসী রেখেছে। মায়ের দাসী-বৃত্তি করবার জন্যে নয়নতারাকে রেখে গেছে দেশে। শাশুড়ী শয্যাশায়ী। সে আর কোনোদিন শয্যা ছেড়ে উঠবে না। আধখানা অঙ্গ বাতে পঙ্গু। দিনরাত কাঁদে কঁকায় আর নয়নতারার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে। ঘুমায় না একফোঁটা।

কবরেজ একটা ওষুধ দিয়েছে। 'যদি ঘুম না আসে, অত্যন্ত ছটফট করে তবে বড়িটার আধখানা ভেঙে দুধে মিশিয়ে খেতে দিও।' বলেছে কবরেজ। 'আমি রোজ ভাবি আধখানা না, একটাও না, সব ক'টা বড়ি একসঙ্গে দুধে গুলে খাইয়ে দেব, যেন তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ে, আর যেন না সে-ঘুম ভাঙে। একটা আধমরা মানুষ বিছানায় শুয়ে শুয়ে কী জ্বালান জ্বালাতে পারে, না-দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। কাল রাতে ওষুধটা দেবার আগে তোমাকে যদি দেখতাম ত সব ক'টা বড়ি গুলে দিতাম। এতদিন দিইনি, বেটী মরলে, আমি যে নিঃসঙ্গ হয়ে যেতাম। এই একলা-পুরীতে থাকতাম কী করে। তুমি এসেছ এবার দেব।'

যেন আমি আসব নয়নতারা জানত। যেন আমার জন্যেই সে পথ চেয়েছিল। আশ্চর্য, দু'দিন যেতে না যেতে সত্যি সে সব বড়ি দুধে গুলে খাইয়ে দিল শাশুড়ীকে। গাঁয়ের সরল মানুষরা এতটুকু সন্দ করল না। বুড়িটা মরতই, দু'দিন আগে পিছে মরবেই, আর বিছানা ছেড়ে উঠবে না জানত বলেই যেন সবাই সব সময় তৈরি হয়েছিল—নয়নতারা হাঁক দিলেই ছুটে আসবে।

তারা এল। লাঙল ফেলে, তাঁত ফেলে, কামারশালা, মুদী-দোকান ফেলে। সকলে মিলে নয়নতারার শাশুড়ীকে নদীর ধারে পোড়াল। আমাকে বলল, 'তুমি বাপু যখন আছোই আরও দু' পাঁচটা দিন থাক। ওর স্বামীকে চিঠি দিয়েছি, এসে পড়ল বলে, তখন যেও। নয়ত এই একলা মানুষটা কোথায় কার বাড়িতে গিয়ে থাকবে। এদিকে খালি ঘরদোর পেয়ে চোর ছ্যাচড়ে তছনছ করে দেবে সব।'

যতদিন যাচ্ছিল, আমি ছটফট করছিলাম। যেন শিকল-বাঁধা দাঁড়ের-টিয়ে—দানাপানি খাচ্ছি, আদর কুড়োচ্ছি কিন্তু নীল আকাশ আর সবুজ বন দেখে দেখে আমার মন বিকল হয়ে উঠছিল।

ক্ষেত-খামার সামলাতে আমার ভাল লাগছিল না। বললাম, 'অনেকদিন ত হল, চল এবার বেরিয়ে পড়ি।'

নয়নতারা আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'জানি তোমাকে ধরে রাখতে পারব না। তোমার চোখের বাউল-চাউনি সেদিন রাতেই আমার চোখে পড়েছিল। ও চোখের টান আমি সইতে পারিনি; কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি পথে বেরোবো কেমন করে, মেয়েমানুষের শরীরটা যে পথে বেরোনোর কত বড় বাধা সে তুমি বুঝবে না।'

সুতরাং আবার আমি একলা-পথিক।

হেথা নয় আর কোথা অন্য কোনখানে। যেখানেই যাই অস্থির চলিষ্ণু মন ক্রমাগত এগিয়ে যেতে চায়। এগিয়ে চলেছে। প্রবল শীত কিংবা দারুণ বর্ষা পথ চলায় বাধা হলে কখনো কখনো কিছুদিনের জন্যে কোথাও আটকে থেকেছি। কিন্তু পথ আবার হাঁটবার উপযুক্ত হলেই বেরিয়ে পড়েছি তখনই। বহু নারীর সাহচর্যে এসেছি কিন্তু সাহচর্য দিতে কেউ আমার সঙ্গে পথে নেমে এল না। কেউ রাত্রির স্বপ্নের মতন এসে ভোর হবার আগেই সেই স্বপ্নের মধ্যে মিলিয়ে গেল। কেউ নিঃশব্দে বিদায় নিল। কেউ বিদায় নিতে চোখের জল ফেলল। কিন্তু বিদায় নিয়েছে সকলেই। কেউ সর্বান্তঃকরণে চায়নি আমাকে, সনির্বন্ধ অনুরোধ করেনি তাকে আমার পথ চলায় সঙ্গিনী করতে। ভালবেসে সর্বস্ব দিয়েও তবু কেউ সঙ্গ নিতে পারেনি। আমাকে ক্ষণকালের জন্যে পেতে বিবাহিত জীবনের চিরকালের প্রতিশ্রুতি ভাঙতে দ্বিধা করেনি অথচ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সেই বিবাহিত জীবনেই ফিরে গেছে দ্বিচারিণী। কিন্তু আমিও কি কাউকে সর্বান্তঃকরণে চেয়েছিলাম? না। আসলে আমিই নির্বন্ধ জীবন-পিয়াসী, আমার বিমুক্ত-জীবনের চেয়ে আর কেউ বেশী প্রিয় নয়। আমি এমন একটি মুখ মনে করতে পারি না, অন্য

নারীর বুকে শুয়ে যার কথা আমার মনে পড়েছে যার জন্যে আমার মন কেঁদেছে। তাদের জন্যে আমার, আমার জন্যে তাদের মনে ভালবাসার কোন স্থায়ী বন্ধন গড়ে ওঠে না কেন? ভালবাসা এত ক্ষণস্থায়ী কেন ভেবে আমার মন বিষণ্ণ হয়। আমি বিভ্রান্ত হই, বিস্ময় বোধ করি। আমি কারো সংস্পর্শে এলে ভালবাসা জ্বলে উঠেছে যেমন এক মুহূর্তে, নিভে যেতেও তেম্নি মুহূর্তের অধিক লাগেনি। ভালবাসার মধ্যে কি এই স্ফুলিঙ্গের অধিক আর কিছু নেই? সর্বত্র, সকলের মধ্যেই কি ভালবাসা এ-ই রকম, একই রকম? অথবা আমারই কোন ত্রুটি, আমারই মধ্যে রয়েছে কোন দোষ? আমার জীবনের মধ্যেই কি এমন কোন অসম্পূর্ণতা আছে যা আমার সাহচর্যে এলেই চোখে পড়ে, টের পাওয়া যায়, চিরকাল ধরে রাখার মানুষ এ নয়, এ মানুষকে ধরে রাখা যায় না, যাবে না। নাকি আমি একটি সুন্দর পুতুল বই কিছু না, আমাকে দেখলেই আমাকে নিয়ে ক্ষণকাল খেলবার বাসনা জাগে, সে বাসনার তৃপ্তির পরে আমাকে আর প্রয়োজন থাকে না নারীর, অনায়াসে ফেলে রেখে অন্য কাজে চলে যেতে পারে। কিংবা নয়নতারাই ঠিক, মেয়েমানুষের শরীরটাই পথের পক্ষে পরম বাধা।

তবু সম্পূর্ণ সত্য এখনও আমার জানা হয়নি। কেননা, এখনও আমি কোন কুমারীর সাহচর্যে আসিনি। লজ্জাবতী কুমারীর রক্ষণশীল শরীর জীবন ও জগৎকে কিভাবে গ্রহণ করে জানি না। আমি শুধু জেনেছি বিবাহিতাদের। বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা জীবন ও জগৎকে দেখতে শিখেছে; কিন্তু তাদের কাছেও আমি কম শিখিনি। প্রত্যেকেই নারীত্বের কিছু বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখে গেছে আমার মনে। কারো গ্রীবাভঙ্গী, কারো চোখের চাহনি কারো রমণ চুম্বন-রীতি নারী-মানসের অনেকখানি উন্মোচন করেছে আমার কাছে।

আমাকে অনেকখানি অভিজ্ঞ করেছে। আমি বুঝেছি, এত বিবাহিতা নারী যে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে সে আমার সবে-যৌবনে-পা দেওয়া সৌন্দর্যের জন্যে না। তাদের কাছে আমি আত্মভোলা ছন্নছাড়া এক শিশু, পরম স্নেহাস্পদ, বুকে করে রাখবার মতন। আমাকে দেখলেই তাদের বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে করে। মুহূর্তে সে ইচ্ছে প্রবল হয়ে রিরংসায় অস্থির হয় বলেই তারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার বুকে। কিন্তু যেহেতু নির্ভর করবার মতন সবল পুরুষ এখনও হয়ে উঠিনি কেউ অভ্যস্ত জীবন, নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে আসতে ভরসা পায় না। হয়ত তাদের মধ্যে সে প্রেরণা সঞ্চারের ঐকান্তিক ইচ্ছেও আমার মধ্যে নেই। আমার মধ্যে কী আছে, আমি স্পষ্ট করে কী চাই, আমিই কী জানি ?

৪

এতক্ষণে আমি হাঁটুটা টান করলাম। হাতটা ছড়ালাম। সকালের সূর্যের দিকে তাকিয়ে খুশীতে হাই তুললাম। পৌষ-সকালের উজ্জ্বল উষ্ণ রোদ কখন নিমেষে আমার সারা রাতের ক্লেশ কষ্ট মুছে দিল। তার কোমল শুশ্রূষার মধ্যে আমি পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমি অশ্বত্থগাছটার শান-বাঁধানো গুঁড়িটাতে কাপড়ের খুঁট গায়ে দিয়ে শুয়েছিলাম। হাঁটু দুটোকে মুড়ে দু'হাতে বুকের মধ্যে চেপে রেখেছি। পৌষের কনকনে শীত ত্বক মাংস ভেদ করে হাড়ে বিঁধছিল। আর মনে পড়ছিল, পাঁচদিন আগে পর্যন্ত আমি দরজা জানালা বন্ধ একটা গরম ঘরের মধ্যে লেপের তলায় ঘুমিয়েছি। সারারাত আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রেখেছে কাজল।

কাজলের সব ছিল। স্বামী ছিল, একটি সন্তান ছিল আর সারা জীবন সুখে থাকতে পারে এমন সচ্ছল অবস্থা ছিল। সব ফেলে একদিন যার হাত ধরে সে বেরিয়ে এসেছিল আর একদিন সে তাকে ফেলে চলে গেছে; কিন্তু নিঃসম্বল রেখে যায়নি। আমি তাকে দেখেছি। আমিই ত তার বেডিং সুটকেস নৌকোয় তুলে দিয়ে এলাম। আমি তার ছোট্ট সুটকেশ হাতে আর বেডিংটা কাঁধে করে পেছনে পেছনে এসেছি। কাজল আর সে আগে আগে হাত ধরাধরি করে গেছে।

যে জল-নিকাশী খালের ওপর দিয়ে নীলাদ্রি ব্রীজ বানাবে বলেছিল। ব্রীজ তৈরি হলে কাজলকে নিয়ে প্রতি শনিবার জীপে

করে কলকাতায় যাবে, সিনেমা থিয়েটার দেখবে ফুর্তিটুর্তি করে সোমবার সকালেই আবার চলে আসবে, সেই খালের ভিতর দিয়ে নীলাদ্রি একলা নৌকোয় করে চলে গেল। ব্রীজ তৈরি করে গেল না নীলাদ্রি। সে ব্রীজ আর কোন ইঞ্জিনিয়ার এসে গাঁয়ের মানুষের জন্যে করবে। ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্রীজ করবার প্ল্যান যখন আছে, ওটা হবে। কিন্তু কাজলের জন্যে নীলাদ্রি করে গেল না। ব্রীজের সংযোগ সৃষ্টি না করে সে যে ক্যানেলের ব্যবধানটাই জিইয়ে রাখতে চেয়েছে, আমরা, আমি আর কাজল তখনও জানি না।

জানলাম বাড়ি ফিরে এসে। আমার পকেটে স্ট্যাম্প আঁটা খামটা পুরে দিয়েছিল নীলাদ্রি। দিয়ে হাতে স্যুটকেশ আর ঘাড়ে বেডিং তুলে দিয়েছিল। নিজে আর একটা স্যুটকেশ হাতে তুলে নিয়ে বলেছিল, 'নৌকোয় এ দুটো তুলে দিয়ে ফেরার পথে পোস্ট অফিসে চিঠিটা ফেলে দিস।' বাড়ি এসে চিঠি পোস্ট করবার কথা মনে পড়ল।

'কে চিঠি পোস্ট করতে দিয়েছে, নীলাদ্রি? দেখি কাকে লিখেছে।'

কাজলকে চিঠিটা দেখাতে গিয়ে আমার চোখে পড়ল নামটা। প্রিয় কাজল, কাজল ভিলা।

খামটা তার হাতে দিলাম। পোস্ট করাই হল। না, শুধু পোস্ট না, একেবারে পৌঁছে দেওয়া হল যথাস্থানে।

কাজল খামটা হাতে নিয়ে ছিঁড়ে চিঠিটা বের করল। বারান্দার থামে হেলান দিয়ে চিঠিটা পড়তে সুরু করেছে; মাত্র কয়েক লাইনের চিঠি নিমেষে শেষ হয়ে গেল। এবং সেই এক নিমেষেই কাজলের চেহারা পালটে গেছে। লাল হয়ে উঠেছে মুখ, এলোমেলো হয়ে গেছে চুল, আঁচল খসে পড়েছে। হো-হো করে হাসছে কাজল, তার চোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে।

চিঠিটা ফেলে দিয়েছিল কাজল। কিংবা হাত থেকে খসে পড়ে গেছে। আমি কুড়িয়ে নিলাম।

প্রিয় কাজল,

আমি চলে যাচ্ছি, আর ফিরব না। তাই বলে তোমার খুব কষ্ট হবে না। ব্যাঙ্কে তোমার অ্যাকাউনটে দশ হাজার টাকা রেখে দিয়েছি। এ বাড়িটা ত তোমার নামেই কেনা। তোমারই থাকল। কাগজ-পত্র সবই আলমারিতে আছে।

আমাকে দু'দিন বাদে ভুলে যেতে পারবে, যেমন করে তুমি তোমার স্বামী ও সন্তানকে ভুলে গেছ।

নীলাদ্রি

আমি যেন আগেই জানতাম ব্লক ডেভলপমেনটের ইঞ্জিনিয়ার নীলাদ্রি সেন চলে যাবে। আমার সন্দেহ হয়েছিল। নীলাদ্রি সেন একদিন আমাকে তার কাছে টেনে নিয়েছিল। দু'হাতে আমার কাঁধ ধরে আমার চোখের মধ্যে তাকিয়েছিল কয়েক পলক। শেষে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিঃশব্দে বলেছিল, 'না, আমি হেরে গেছি।' আমি যেন সে-নিঃশব্দ কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিলাম।

নীলাদ্রি আমাকে ঈর্ষা করত কিন্তু সহজে হারতে চায়নি। বরং কাজলের জন্যে নীলাদ্রির যে টান শিথিল হয়ে আসছিল আমার প্রতি ঈর্ষা সে টানকে আবার করে প্রবল করেছে। কাজলকে নিয়ে শেষের দিকে সে খুব মাতামাতি করত। প্রেমের এই তীব্রতা আমিই নীলাদ্রির মধ্যে এনে দিতে পেরেছি চিন্তা করে নীলাদ্রি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল অথবা কাজলের যে ক্ষুধা সে মেটাতে পারছিল না তা আমি মেটাতে পারব ভেবে সে প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল জানি না; এখন মনে হচ্ছে আসলে কাজলকে সুখী করবার জন্যেই সে তাকে ছেড়ে চলে গেল। কাজল আমাকে পেয়ে অধিক সুখী এটা বুঝতে পেরেই যেন নীলাদ্রি চলে গেছে। কাজলকে সে সত্যি ভালবাসত

তাই সে যাতে না আর্থিক কষ্ট পায় সুব্যবস্থা করেছে। কিংবা নীলাদ্রির জন্যে কাজল যে ত্যাগ স্বীকার করেছে এ তারই খেসারত।

নীলাদ্রি চলে গেলে কাজল আমাকে তার একমাত্র অবলম্বন বলে বুকে টেনে নিয়েছিল। সে আমাকে বুকে করে কখনো এমন করত যেন সে তার ফেলে-আসা সন্তান পেয়েছে। আবার কখনো আমাকে নিয়ে এমন হয়ে উঠত যেন সে তার স্বামী ও নীলাদ্রিকে আমার শরীরে একসঙ্গে ভোগ করতে চায়।

সে আমাকে তার সর্বস্ব দিতে চেয়েছে।

'সব নাও, সব। সব-ই তোমার। তুমি থাক। তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।'

সব মানে নীলাদ্রির দেওয়া বাড়ি। টাকা। কাজলের শরীর।

কাজল আর কিছু দিতে পারল না। হৃদয় দিতে পারল না কাজল। হয়ত কাজলের হৃদয় ছিল না। কাজল তার হৃদয় হারিয়ে ফেলেছিল।

আমি দেহসর্বস্ব কাজলকে নিয়ে থাকতে পারলাম না।

আমার পায়ের কাছে রোদে পিঠ দিয়ে তিনটি মানুষ কথা বলছিল। তাদের মধ্যে কথাবার্তা ক্রমশ শীতের রোদের মতনই উষ্ণ হয়ে উঠছিল। তারা সকলেই কারো ওপরে অসন্তুষ্ট। তাদের বিশ্বাস তারা অজ্ঞ বলে সে তাদের ঠকাচ্ছে। তারা সকলে মিলে একটা কাগজ পড়ে উঠতে পারছিল না।

একজন অসহিষ্ণু লোক বলছিল, 'আমি জানি সে লোকটা ঠকায়নি।'

অসন্তুষ্ট আর একজন বলল, 'তুমি ত পড়তে পারছ না, তবে নিশ্চয় করে বল কি করে?'

রাগী লোকটি বলল, 'ও তার দালাল।'

ওদের রাগারাগিতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আমি

নড়ে-চড়ে আরাম করে শোবার চেষ্টা করছি তখন ওই দালাল কথাটি নিয়ে ওদের মধ্যে তুমুল বেঁধে গেছে। আমি উঠে বসলাম।

'কি নিয়ে ঝগড়া আপনাদের ?'

আমার পায়ে এক হাঁটু ধুলো। মাথার চুল উস্কখুস্ক। কাপড় জামা ধূলি-ধূসর। না-খাওয়া না-স্নান রুক্ষ শরীর। কাজলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিন দিন পেটে ভাত পড়েছে। তু'দিন তুই বৈরাগীর আখড়ায় আর একদিন এক অন্নপ্রাশনের দরিদ্র-ভোজনে। এক ভদ্রলোক আমাকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে পেট পুরে খাইয়ে দিয়েছিলেন। তারপরের তু'দিন অন্নপূর্ণা অপ্রসন্ন—শুধু পুকুরের জল আর চিড়ে মুড়ি খেয়ে কেটেছে। কাজলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অব্দি হাঁটতে হাঁটতে কাল রাতে এখানে এসে পৌঁছেছি।

তিনজনে আমাকে আপাদমস্তক তু' তিনবার দেখল।

একটা পথের ভিখিরী কিংবা বাউণ্ডুলে। হয়ত বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ছেলে। সে জিজ্ঞেস করছে কিনা, কী নিয়ে বিবাদ আপনাদের ?

'মশায়ের ঘুমের বেঘাত হল নাকি ?' একজন বিদ্রূপ করে বলল।

আর একজনের যন্ত্রণা বুঝি সব থেকে বেশী। সে দূরে বসেছিল। উঠে এল নিকটে।

'কি, লেখাপড়া কিছু করা হয়েছে, না ওপাট তুলে দিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরোনো হয়েছে ?'

আমি হাসলাম, 'সামান্য লেখাপড়া জানি।'

'বলি ইংরাজি পড়তে পারো তুমি ?' তৃতীয় ব্যক্তি যেন ধমকে উঠল।

আমি বিনীত হয়ে বললাম, 'চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

তখন তারা আমাকে কোর্টের স্ট্যাম্প আর ছাপ-মারা একটা কাগজ দিল।

আমি মনে মনে সবটা একবার পড়লাম। নিজে বুঝবার চেষ্টা করলাম প্রথমে। শেষে ওদের প্রত্যেকটি শব্দের মানে করে বুঝিয়ে দিলাম কি লেখা আছে দলিলে।

ওরা তিনজনে তখন বিবাদ ভুলে গেছে। খুব খুশী হয়েছে। আমাকে ময়রার দোকানে নিয়ে এসে পেট পুরে খুব খাওয়াল। তাতেও যেন যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেল না।

একজন বলল, 'আচ্ছা দাশমশায়, ওকে আমাদের স্কুলের সেক্রেটারির কাছে নিয়ে গেলে কেমন হয়?'

দাশমশায় আমার দিকে মাথা ঘুরিয়ে শুধোল, 'কিগো ছেলে, মাস্টারি করবে?'

আর একজন ধমকে উঠল, 'করবে না ত লেখাপড়া শিখে বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরবে?'

লেখাপড়া ত এই, ম্যাট্রিক দেওয়া পর্যন্ত। পাশ করেছি কিনা তাও জানিনে তবু রাজি হয়ে গেলাম। এই কনকনে শীতে পথে রাত কাটাতে বেশ কষ্ট।

ওরা আমাকে সেক্রেটারির বাড়ি নিয়ে এল। আমার সম্বন্ধে ওদের আগ্রহ জানাল তাকে। দেখলাম, ওরা মিথ্যে বলেনি, সেক্রেটারির ওপরে ওদের প্রভাব আছে। ওদের অনুরোধ তিনি রাখলেন; কিন্তু আমার ইংরাজি বিদ্যা পরখ করবার উৎসাহ দেখলাম না তাঁর। কাগজ কলম এগিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে দুর্গাপূজা বিষয়ে বাংলায় একটি ছোট প্রবন্ধ লিখতে বললেন।

আমার হাতের লেখা যে সুন্দর, ভাষার ওপরে আমার যে দখল আছে, আমার শিক্ষকের সেকথা আর একবার সত্য বলে প্রমাণিত হল। অবশ্য মুখে কিছু বলেননি কিন্তু আমার রচনা পড়ে তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখেছি আমি, তাছাড়া, তক্ষুনি আমার স্নান আহারের ব্যবস্থা হয়ে গেল। বুঝলাম, চাকরি হল। ভাবলাম, ইংরাজি নয় তাঁর একজন বাংলা-শিক্ষক প্রয়োজন।

সে-ভুল ভাঙল সে-রাত্রিতেই তিনি যখন একগাদা পাণ্ডুলিপি ও আমাকে নিয়ে তার লাইব্রেরিতে এসে বসলেন।

সূর্যশংকর রায়চৌধুরীর পূর্বপুরুষ জমিদার ছিলেন। সে জমিদারি আর নেই। তার স্মৃতি চিহ্ন কিছু জোতজমা প্রজা-বন্দোবস্ত এবং রায়চৌধুরী খেতাবটি আছে। অবশ্য এ বর্ধিষ্ণু গ্রামটির ওপরে তার প্রভাব প্রতিপত্তি সেই পূর্ব-গৌরবের জন্যে নয়। মানুষটি সৎ শক্ত এবং জেদী বলে, অন্যায় সহজে সহ্য করেন না বলে লোকে তাঁকে ভালবাসে। লোক তিনটি আমাকে বলেছিল। সে যে মিথ্যে নয় আমিও জেনেছিলাম। তাঁর ক্রোধ এবং ন্যায়পরায়ণতার আমিও একজন প্রত্যক্ষদর্শী। কিন্তু তারা যা আমাকে বলেনি কিংবা জানত না, আমি তা এখন জানলাম তাঁর সামনে বসে। মানুষটি কবি এবং পর্যটক। তিনি কবিতা লিখেছেন অনেক এবং ভারতবর্ষের পূর্বে উত্তরে পশ্চিমে দক্ষিণে তীর্থ যত আছে দেখতে বড় একটা বাদ রাখেন নি। সামনে যে এক গাদা পাণ্ডুলিপি তা অবসরে বসে বসে সেই তীর্থ-ভ্রমণের স্মৃতি-চারণ।

'শান্তনু, তোমার হাতের লেখাটি সুন্দর আর ভাষাটি মিষ্টি। আমার এই লেখাগুলি সংশোধন করে তুমি পরিচ্ছন্ন করে লিখে দেবে, এই তোমার চাকরি।' বলে তিনি আমার হাতে দপ্তর সমঝে দিলেন।

দু'দিন পরে সকালবেলা সেই দপ্তর সামনে করে উদাস চোখে বাইরে তাকিয়ে আছি, ভাবছি, আনাড়ী মানুষের নড়বড়ে ভাষায় লেখা অপটু চিন্তার এই মহাভারতপ্রমাণ রচনা সংশোধন করে নূতন করে লেখার থেকে পৌষের শীতে কাপড়ের খুঁট গায় দিয়ে পথের ধারে শুয়ে থাকা সহজ কিনা; তখন চোখে পড়ল একখানি মুখ, একজোড়া চোখ, দোতলার জানলা থেকে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই মুখখানি জানলা থেকে সরে গেল।

সূর্যশংকরের পাণ্ডুলিপিতে আছে, তাঁর স্ত্রী দুটি শিশু-কন্যা রেখে যখন সাধনোচিত ধামে গমন করলেন তখন সূর্যশংকরের নিকট এ সংসার শ্মশান বলে বোধ হয়েছিল। সূর্যশংকরের শ্মশান-বৈরাগ্যের সেই সাল তারিখ হিসেব করলে এখন কন্যা দুটির বয়স দাঁড়ায় যথাক্রমে ষোল ও আঠার—আমার থেকে তিন আর এক বছরের ছোট। কিন্তু মাতৃহীন মেয়ে দুটির একটিকেও এতদিন পর্যন্ত তিনি অবিবাহিত রেখেছেন কি? ও মেয়ে হয়ত অন্য কেউ। তা সে যে-ই হোক যখন আমাকে স্থির চোখে দেখছিল, পরিচিত হতে দেরি নেই চিন্তা করে আমার মন প্রসন্ন হল। সে-প্রসন্ন মনে সূর্যশংকরের পাণ্ডুলিপির পাতা ওলটাতে ওলটাতে আর মনে হল না, এ রচনা কাটাকুটি করা ও আবার করে লেখা আদৌ কঠিন কাজ। আমি দুদিনে যা করেছিলাম কয়েক ঘণ্টায় তার চেয়ে অনেক বেশী শেষ করে ফেললাম।

সূর্যশংকরের দু'মহলা বাড়ি। ঠাকুর চাকর ঝি নিয়ে বার-মহলটাই ঝমঝমে, জীবন্ত। সূর্যশংকরের কাছে নানা উপলক্ষে নানা মানুষ আসে। দু'চার দিন এ মহলেই তারা থাকে, খায়, শেষে চলে যায়। অন্দরমহলে তাদের বড় একটা যেতে দেখা যায় না। কাজেই এ বাড়ির যত হৈচৈ সব এ মহলে। ওমহলটা যেমন নিঃশব্দ তেমনি নির্জন। কারা ওখানে আসে যায় থাকে, কিছু বোঝা যায় না এখান থেকে। আমার কৌতূহল হয়। আমি তাকিয়ে থাকি।

প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পাকা বাড়ি এখানে অনেক দেখেছি। কিন্তু এত বড় ও এত জীর্ণ বাড়ি দেখিনি। জমিদার বংশের বাসস্থান বলে বাড়িটা বড়, বুঝি। কিন্তু তাদের উত্তরপুরুষের দারিদ্র্যবশতই বাড়িটা এমন জীর্ণ বলে ভাবব? অনেক জায়গায় পলেসতারা খসে গেছে। দু'চারখানা ইটও অনেক জায়গা থেকে আলগা হয়ে আছে, পড়ার মুখে, পড়ে যাবে, এমন। কিছু

কিছু কড়ি বরগাও শিথিল, নড়বড়ে। কোন কোন ঘরে নাকি বর্ষায় জলও পড়ে। সূর্যশংকরকে ত দরিদ্র বলে মনে হয় না। তিনি নানাদিকে অনেক টাকা খরচ করেন। হয়ত সেই পুরাতন শ্মশান-বৈরাগ্যই এই অবহেলার মূলে; হয়ত অন্য কিছু কিংবা তাঁর মৃত্যুর পরে বংশে বাতি দেবার কেউ নেই জেনে জীর্ণ বাড়িতে নিশ্চিন্ত বাস করছেন। নানা চিন্তা করি। সেই স্থির চোখে চেয়ে-থাকা মুখখানি ভাবি, মনে হয় সে আমাকে সব সময় লক্ষ্য করছে। অস্থিরতা বোধ করি।

এমন সময় কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে সূর্যশংকরের কয়েকজন বন্ধু এলেন। তাঁরা সূর্যশংকরের জোত শুকদেবের চরে পাখি শিকার করবেন। সূর্যশংকর তাদের জন্যে লাইব্রেরি ঘরে জায়গা করে দিলেন, আর আমাকে লাইব্রেরি ঘর থেকে এনে জায়গা করে দিলেন অন্দর-মহল আর বার-মহলের মাঝখানে একখানা ঘরে।

ঘরে একটা মস্ত খাট পাতাই ছিল তার পাশে একটা টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা করে দিয়ে সূর্যশংকর বলেছিলেন:

'বার-বাড়ির গোলমাল এখানে পৌঁছবে না, তুমি নির্জনে বসে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবে।'

সত্যি তাই, সব থেকে আলাদা নির্জন নিশ্চিন্ত এবং একান্ত একলার একখানি ঘর।

এখান থেকে অন্দর মহলের উঠোন দেখি আমি। কোন লোকজন দেখি না। ঝরা আম জামের পাতা উঠোনে ছড়ানো। পাতা-ঝরার দিনে উঠোন ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার রাখা যায় না; কিন্তু সব দিন এ উঠোনে ঝাঁট পড়ে বলে মনে হয় না। উঠোনের এখানে ওখানে কিছু ঘাস জন্মেছে। উঠোনের একপাশ দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথের চিহ্ন। ওপথে কারা হাঁটে জানি না। ওপথের প্রান্তে সিঁড়ি চার পাঁচটা ধাপ উঠে গিয়ে দালানে শেষ হয়েছে। দালানের কয়েকটা থাম চোখে পড়ে আমার।

আমার জানলা থেকে আর কিছু দেখতে পাইনে। মাঝে মাঝে একটা বেড়াল ছুটো ছানা নিয়ে উঠোনে আসে। ধাড়ি বেড়ালটা ঝরা-পাতা থাবায় ধরে ইঁদুর শিকার করতে শেখায় ছানাদের। কখনো বেড়ালটা শুয়ে থেকে আস্তে আস্তে লেজ নাড়ে। লেজটাই যেন ইঁদুর। ছানা ছুটো বারে বারে নড়ন্ত লেজের ওপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, শিকারের উত্তেজনায় কামড়েও দেয় ছু' একবার। তখন বেড়ালটা দাঁত বের করে রাগের শব্দ করে, থাবা মেরে শাসন করে।

পড়ন্ত বিকালের রোদে শুয়ে বিড়ালটা ছানা ছুটো নিয়ে খেলছিল। আর কিছু দর্শনীয় ছিল না বলে আমি ওদের খেলা দেখছিলাম। কোন মৃছ শব্দ পায়ের, কিংবা নিঃশ্বাসের, কোন মৃছ গন্ধ চুলের কিংবা সাবানের আমাকে খুব আস্তে যেন স্পর্শ করল। আমি ফিরে তাকালাম। আমাকে ও দেখছিল। চোখা-চোখি হতেই টেবিলের ওপরে চোখ সরিয়ে নিল। আমি কখনো কুমারীর চোখ দেখিনি। এমন লাজুক নম্র উচ্ছল অথচ গভীর চোখ আমাকে মুগ্ধ করল।

সে টেবিলের কাগজ-পত্র দেখছিল, সেখানেই চোখ রেখে বলল, 'বিকেলেও ঘরে বসে থাক কেন? বেরোবে, একটু বেড়াবে।' সে আস্তে-পায় প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

আমি ছু'পলক স্থির চোখে তাকে দেখলাম। ইতস্তত করলাম একটু। শেষে বেরিয়ে এলাম। তার পেছনে পেছনে যাচ্ছিলাম। আমি তার পেছনে আসছি, সে জানছিল। সে ধীরে ধীরে হাঁটছিল। যেন পাশাপাশি হাঁটতে আপত্তি নেই। আমরা ছু'জনে একটা ফুলের বাগানে পৌঁছলাম। বাগানটিকে খুব যত্ন করা হয় না তবু সুন্দর। গাঁদা ফুল ফুটেছে অনেক। নানা জাতের বড় বড় গাঁদা ফুল প্রথমেই চোখে পড়ে। কিছু স্থল-পদ্ম আছে একপাশে। সেখানে সন্ধ্যামণির ঝোপে গোলাপী হলুদ সন্ধ্যামণি ফুটতে সুরু করেছে। একটি নীলকণ্ঠের লতা কাঠগোলাপের

গা বেয়ে উঠেছে, কয়েকটি নীলকণ্ঠ কুঁকড়ে আছে লতার গায়। বিকেলের রোদে নীলকণ্ঠের চিকরিকাটা চিকণ কচি পাতা সবুজে-সোনায় মিনা করা মনে হচ্ছিল। তার পরেই একধারে অজস্র মৌসুমী ফুল—হলুদ লাল বেগুনী, যেন গাঁদার সঙ্গে পাল্লা ওদের। প্রজাপতি ঘোরাঘুরি করছিল, মৌমাছি গুনগুন করছিল, পড়ন্ত-বেলার জাফরানি রং রোদে মাখামাখি হয়েছিল বাগানটা। সে রোদে নেয়ে কয়েকটা ঘুঘু অলৌকিক পাখি হয়ে উঠেছে। আমি ওর হাত ধরলাম। পলকমাত্র হাতখানা ছুঁয়ে থাকতে দিয়ে সে হাত ছাড়িয়ে নিল ও আর দাঁড়িয়ে থাকল না। আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম, সে বাগান পেরিয়ে মুরাম বিছানো সরু রাস্তা বেয়ে কিছু দূর হেঁটে কয়েকটা ঘনপাতার গাছ শেষে কড়িডোরের বড় বড় থামের আড়ালে আস্তে মিলিয়ে গেল। বাগানটা তারপরে আমার চোখে কতকগুলি এলোমেলো ঝোপঝাড়, বাজে ফুল গাছের অনাবশ্যক জঙ্গল বলে মনে হয়েছে। রোদের রংও মলিন পিতলের মতন দেখছিলাম। আমি ফিরে আসছিলাম তখন একটি মেয়েছেলে এসে ডাকল। বাড়ির ঝি-টি কেউ হবে।

'দাদাবাবু, পিসিমা আপনাকে ডাকছেন।'

বুঝলাম, আমি যাকে অনুসরণ করে এখানে এসেছি, সেই মেয়ে গিয়ে তার পিসিকে সংবাদটি দিয়েছে। সূর্যশংকরের রচনায় পড়েছি, তাঁর এক বালবিধবা দিদি আছেন। মাতৃহারা কন্যা দু'টিকে তিনিই পরম স্নেহে লালনপালন করেছেন।

আমি ঝির সঙ্গে ফিরে এলাম। যে পথে সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সে পথে আমাকে নিয়ে এল ঝি।

আমি দরদালানে উঠে বুঝলাম আমি যে উঠোনে বেড়ালের খেলা দেখি সে এবাড়ির পেছনের দিক, অব্যবহার্য অংশ। সেখানে চেয়ে থেকে কোন প্রিয়দর্শিনীকে কোন দিন কেন দেখিনি এখন জানলাম। আমি কী বোকার মতন প্রতীক্ষা করেছি!

একজন প্রবীণ মহিলা একখানি বেতের চেয়ারে বসে কী পড়ছিলেন।

'দাদাবাবুকে ডেকে এনেছি।' ঝি সংবাদ দিয়ে চলে গেল।

তিনি বই থেকে মুখ তুললেন। চশমা খুলে আমাকে দেখলেন।

'সন্ধ্যা বলল, তুমি বাগানে বেড়াতে এসেছ। শুনে শিবানীকে পাঠালাম। বস বাবা, বস।' তিনি তাঁর নিকটের শূন্য চেয়ারটার দিকে তাকালেন।

আমি বসলে তিনি আমাকে নিঃশব্দে কয়েক পলক দেখলেন।

'ক'দিন থেকে ভাবছি, তোমাকে ডেকে পাঠাব, তোমার কথা শুনব। সূর্য ঠিকই বলেছে। তোমার চেহারা দেখে মনে হয়, তুমি বড় ঘরের ছেলে। কপাল দেখে বোঝা যায় তুমি বুদ্ধিমান কিন্তু চোখ দু'টি তোমার এমন উদাসীন কেন? সন্ন্যাসী নও। অথচ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছ। কী দুঃখ তোমার? ঘরে ফিরে যাও, বাপ মাকে কষ্ট দিও না।' থেমে থেমে নরম স্নেহের গলায় তিনি কথাগুলি বললেন।

'আমার মা নেই।' বলতে আমার গলা বুজে এল।

তিনি বিষণ্ণ চোখে আবার আমাকে দু' মুহূর্ত দেখলেন।

'তাই তুমি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়েছ? কিন্তু মা ত সবাইর থাকে না বাবা, আমার সন্ধ্যা মালতীরও মা নেই।'

'আপনি আছেন।'

'তোমারও আর পাঁচজন আছে।'

'তারা আমার কেউ না।'

'যে মা নেই তাকে পথে কোথায় খুঁজে পাবে?'

'জানি না।'

'শান্তনু!'

'পিসিমা!'

'তুমি আমার কাছে থাক।'

আমি মাথা নত করলাম। তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন। 'মন স্থির কর বাবা। তুমি এখানে থাক। তুমি সুখী হবে।'

রাত আটটার মধ্যে রাত্রির খাওয়ার পাট চুকে যায়। তারপর সূর্যশংকর আমাকে নিয়ে বসেন। দশটা বাজলে তিনি উঠে যান। আমিও শুয়ে পড়ি। আজ সূর্যশংকর নেই। আমি একাই পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসেছিলাম। ভাল লাগছিল না। হঠাৎ পিসিমা বলে ডেকে মনের মধ্যে যে কষ্ট ছলছলিয়ে উঠেছিল এখন আর তা নেই। প্রবীণ পলিতকেশ স্থূল-শরীর বৃদ্ধাকে কিছুতেই আমি মায়ের জায়গায় বসাতে পারছিলাম না। সেখানে বারে বারে এসে সার বেঁধে দাঁড়াচ্ছিল বেদেনী যাযাবরী পদ্মা সুভদ্রা নয়নতারা কাজল ও আরও অনেকে। একে একে তারা সকলে মিলিয়ে গেলে শুধু সন্ধ্যাকে দেখছিলাম। তার লাজুক আয়ত চোখ, দীর্ঘছন্দ পাতলা চেহারা, ঈষৎ মলিন বিকালের রোদের মতন রং আমার মন অবশ করে আনছিল।

টাইমপিসটা টিকটিক করে চলেছে। কোথায় একটা রাতের পাখি থেকে থেকে ডেকে উঠছে। শীতের বাতাসে বিবর্ণ পাতা ঝরছে টুপটাপ। চারদিক নিঃসাড়। শেয়াল কুকুর হেঁটে গেলে পায়ের শব্দ শোনা যায়।

ঘুম আসছিল না। কাজও ভাল লাগছিল না। চোখ বুজে বিছানায় পড়ে থাকতে ইচ্ছে হল। আমার জন্যে পথে পথে দোর খোলা। আমি কখনো দোর বন্ধ করি না। দোরটা শুধু ভেজিয়ে দিই। ভেজিয়ে দিয়ে এসে হারিকেনটা নিভিয়ে দেব তখন ভেজানো দরজা আস্তে খুলে গেল। বাতিটা নিবু-নিবু হয়ে আসছিল। আবার উসকে দিলাম। উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম, সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে। সে এসে টেবিলে আমার

হাতের কাছে হাত রাখল। আমি আমার হাতে তার হাত তুলে নিলাম। বাগানে পলকের জন্যে সে আমার হাতে হাত রাখতে দিয়েছিল। এখন সে হাত যেন অনন্তকালের জন্যে আমার হাতে তুলে দিয়েছে, এমন শিথিল হয়ে রইল আমার হাতে।

'কী ঠিক করলে তুমি, থাকবে ত ?'

আমি তার থুতনি ধরে চোখের মধ্যে তাকালাম। লাজুক চোখ বড় অনিচ্ছায় আস্তে আস্তে বুজে গেল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য, আমার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। আমি দু' হাতে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলাম। আমি তাকে চুমু খেলাম। অনভ্যস্ত কুমারী-শরীর আমার বুকের মধ্যে ক্রমাগত আড়ষ্ট প্রসারিত হচ্ছিল। যেন প্রাণপণেও সে তার শরীর আমার শরীরে সংলগ্ন রাখতে পারছিল না। কুমারী-শরীরের সহজাত প্রতিরোধ, রক্ষণ-শীলতাও বলা যায়, যেন ওর যৌবনের ইচ্ছা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে ওর শরীরের শুচিতা রক্ষা করতে আমার বুক থেকে ওকে ছিঁড়ে নিতে চাইছিল, ছিঁড়ে নিয়ে গেল। টেবিলে ভর দিয়ে সন্ধ্যা মৃদু কাঁপছিল।

বিষণ্ণ গলায় বলল, 'তুমি রাগ করোনি ত ?'

আমি হাসলাম, ওর গালে গলায় কাঁধে খুব আলতো করে হাত বুলিয়ে দিলাম।

ও বলল, 'অনেকে আমাকে ভালবেসেছিল, আমি এমন করে কারো কাছে আত্মসমর্পণ করিনি।'

'কেন ?'

'আমার ভয় করত। ওরা যদি কেউ ভালবেসে আমাকে আমার বাবার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যায়। মালতীরও সেই ভয়। তাই আমরা কেউ বিয়ে করিনি। আমরা বাবাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।'

বলতে বলতে সন্ধ্যা এতক্ষণে সহজ হয়ে এসেছে। ওর

শরীরের সেই থরথর সংকোচ আর ছিল না। সে স্নিগ্ধ কৌতুকে আমার দিকে তাকাল। আমি তাকে আবার বুকের মধ্যে টেনে নিলাম। এবার সে অনায়াসে নিজেকে সমর্পণ করতে পারল। বেড়ালের মতন নেতিয়ে থাকল বুকের মধ্যে। বুকে বুক রেখে অনেকক্ষণ থাকলাম আমরা। শেষে কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'আজকের মত ছুটি দাও।'

ওকে ছেড়ে দিলাম। একটা দীর্ঘশ্বাসের মতন সে নিমেষে মিলিয়ে গেল। কিংবা স্বপ্নের মতন।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেছে। আমার জানলার সামনে ডালিম গাছটার ডালে বসে কয়েকটা শালিক আর ফিঙে মিলে অত্যন্ত সোরগোল করছিল, সেজন্য কিনা চিন্তা করতে মনে হল, যেন আমি ঘুমাইনি সারারাত, যেন সারারাত জেগে থেকে কত কি সব ভেবেছি। অথচ কী যে ভেবেছি কিছুই মনে করতে পারছিলাম না। তখনও রোদ ওঠেনি। কেবল আসন্ন দিনের আলোয় আকাশটা আর্শির মতন দেখাচ্ছে। গাছের ডাল-পল্লবের আড়ালে ঝোপে-ঝাড়ে তখনও অন্ধকার বাদুড় চামচিকের মতন ঝুলছিল। আমি বেরিয়ে এলাম। একটা নিমের ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁতন করবার জন্যে চিবিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে করছি, হঠাৎ চিন্তার সূত্রটা মনে পড়ল।

সন্ধ্যা বলেছিল, 'আমি এমন করে কারো কাছে আত্মসমর্পণ করিনি।' অথচ সন্ধ্যাকে অনেকে ভালবেসেছিল। তবে কি বুঝতে হবে, ভালবাসা দিয়ে কুমারী-শরীরের প্রতিরোধ জয় করা যায় না। সে নিজে যেদিন ভালবাসবে সেদিনই কেবল সে তার ভিতরকার প্রতিরোধ ভেঙে এসে আত্মসমপণ করতে পারবে? ভালবেসেছে বলেই, তার ভিতরে ভালবাসা জন্মেছে বলেই, কাল তা সে পেরেছে? কাল রাতে কি ভেবেছি জানিনা, এখন মনে হল, এ কৃতিত্ব যেন আমারই। আমি জ্যামিতি বীজগণিত শব্দ ও

ধাতুরূপ আয়ত্ত করতে পেরেছি অনেক কষ্টে; কিন্তু ভালবাসার বিদ্যে আয়ত্ত করতে আমাকে এতটুকু চেষ্টা করতে হয়নি, এ যেন আমার জন্মগত পারদর্শিতা। অনায়াসলব্ধ। কিংবা জন্ম থেকেই আমি যেন প্রকৃতির রহস্যের ভিতরেই থেকে গেছি। যারা, যে সকল প্রেমিক, সে রহস্যের বাইরে আছে তারা কঠোর সাধনা ও চেষ্টা করেও তাকে ভেদ করতে পারে না, হয়ত অল্পই পারে। কিন্তু আমার কাছে সে রহস্য অনায়াসে উন্মোচিত হয়, আত্মসমর্পণ করে। সহসা যেন অনুভব করলাম, যত নারীর সাহচর্যে এসেছি তাদের প্রত্যেকের চোখ মুখ কণ্ঠস্বর অঙ্গন্যাস আত্মদান বিভিন্ন হলেও সেই বিবিধের মধ্যে এক নিগূঢ় ঐক্য আছে, আমি যেন সেই ঐক্য আবিষ্কার করে ফেলেছি। সকলের মধ্যে একজনকেই পাই, নানাজনের নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একজনই যেন বিশেষিত হয়ে ওঠে।

অন্যমনস্ক মতন হাঁটতে হাঁটতে কখন এতদূরে মাঠের সামনে এসে পড়েছি। শ্যামল শস্যাংকুরের গালিচা পাতা ধু-ধু বিশাল মাঠ দূরে কালো হয়ে দিগন্তে মিশে আছে। ক্রমশ সে কালোর গায়ে সোনালী রংয়ের আলপনা ফুটে উঠল, একটু পরে সে আলপনার ওপরে একটা মস্ত সিঁদুর ফোঁটার মতন জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিল সূর্য। আমি দেখছিলাম। আমার মনে আছে, আমি যেন দেখছিলাম ওই সূর্য-শরীর থেকে আমার মা আমার দিকে উড়ে আসছে। আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম। অসহ্য সুখে আমার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। আমি ঘাসের ওপরে বসে পড়ে মুখ ঢেকে ফেলেছিলাম। হলুদ রৌদ্রে সমস্ত দিক যখন উজ্জ্বল ও উষ্ণ হয়ে উঠেছে তখন আমি শান্ত হতে পেরেছি।

যে পথ দিয়ে ভোরের অন্ধকারে গেছি, এটা সে পথ নয়। কোন্ পথ ধরে ফিরছি, আদৌ ফিরছি কিনা জানিনা, গ্রাহ্যও ছিল না। হঠাৎ সকালের রৌদ্রে অলৌকিক অজস্র গাঁদা ফুল

আর প্রজাপতির ওড়াওড়ি দেখে থমকে দাঁড়ালাম। কালকের বিকেলের সেই বাগান আজকের সকালে ভিন্ন কোণ থেকে অন্যরূপে দেখা দিল। আমি মুগ্ধ মানুষের মতন এগুচ্ছিলাম, বেড়ার কাছে একটি মানুষের স্থির মূর্তি দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। স্থির গম্ভীর অপলক সে আমাকে দেখছিল। সকালের হাওয়ায় তার রুক্ষ চুল উড়ছিল, সকালের রৌদ্রে তার কানের দুল জ্বলছিল। তার অপলক চোখে একটা নিষ্ঠুর দৃষ্টি বিদ্ধ করছিল আমাকে। সে দৃষ্টিতে বিদ্ধ হয়ে আমি হেসেছিলাম। আর ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গিনীর মতন মাথা দুলিয়ে সে চলে গিয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছি, কাল রাতে সন্ধ্যা আমার কাছে এসেছিল, মালতী তা জেনে ফেলেছে, তার এত ক্রোধ এত জ্বালা সেজন্যে। বুঝি মালতীও আমাকে ভালবেসেছে। নয়ত এ ক্রোধ অন্য পথ নিত, অন্য রূপ।

ঘরে ফিরে দেখি আমার চা জলখাবার ঢাকা দিয়ে রাখা। আজ আমার খুব দেরি হয়ে গেছে। আমি চায়ের কাপটা তুলে নিলাম। এক চুমুক খেয়ে আকাশের দিকে তাকালাম, লেপা-মোছা আকাশে আমার প্রশ্নের উত্তর লেখা নেই, আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি মনের মধ্যে খুঁজছিলাম। কোন্ ভালবাসা সত্য, শরণাগতের না বিদ্রোহিণীর? মনে হল, না, ভালবাসার সত্য মিথ্যে নেই, ওটা এক ভালবাসারই দুই রূপ। আমি ভালবাসার বহু রূপ দেখেছি। আমি যেন ভালবাসার বহু রূপের মধ্যে দিয়ে ভালবাসার মৌল রূপটির কাছে পৌঁছতে চাইছি, সেই অপরূপই যেন আমার মায়ের রূপ। মালতীর ভালবাসা সেই অপরূপেরই আর এক রূপ, নূতন রূপ।

মালতীর চিন্তায় আমি যেন সন্ধ্যাকেও ভুলে গিয়েছিলাম। স্নান খাওয়া পাণ্ডুলিপি সংশোধনের কাজ অথবা ভাল না লাগলে চুপ করে বসে থাকা সব কিছুর মধ্যে সব সময় আমার মনে মালতী পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। আমি যেন অনুক্ষণ মালতীর প্রতীক্ষা

করছিলাম। কিন্তু এল সন্ধ্যা। রাত দশটায় নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে হারিকেনটা নিবিয়ে দিল।

আমার বুকের মধ্যে মাথা রেখে বলল, 'কাল বাবা আসবে, পিসিমা তাকে সব বলবে। তুমি বাবাকে বলবে, তুমি এখানে থাকতে রাজি, তুমি থাকবে।

'স্কুলে মাস্টারি কর, বাবার লেখা সংশোধন কর, অথবা, কিছুই করবে না, কি যা খুশী করবে। তবু তুমি থাকবে…'

আমি ঠোঁটে ঠোঁট চাপা দিয়ে ওকে নীরব করে দিলাম।

রাত যেন অনেক হয়েছে, খুব চমকে উঠে সন্ধ্যা ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে গিয়েছে। আমি জানি মালতী ঘুমোয়নি। সে সব দেখছিল। সব দেখেছে।

সকালবেলাই তা টের পেলাম। আমার ধারণা সকালবেলাই সত্য হল। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ডালিমের ডালে শালিকগুলির গুলতানি দেখছিলাম। টেবিলের ওপরে একটা শক্ত আওয়াজ হতে ফিরে তাকিয়ে দেখি মালতী। ওর হাতে কাগজ চাপা দেবার কাঁচের ডেলাটা। পেপার ওয়েটটাকে সে খুব শক্ত করে ধরেছিল। আমি ওর মুখের ওপরে চোখ পাতলাম। কালকের মতন রুক্ষদৃষ্টি পেতে ও আমাকে দেখছিল। আমি চোখ তুলতেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে টাইমপিসটাকে দেখতে লাগল। আমি দেখলাম ওর চোখের সাদা ঈষৎ লাল, চোখের কোলে কালি, গাল চিবুক শুকনো। কাল বুঝি চুলে সাবান ঘষেছিল এখন শুকনো বিবর্ণ চুলগুলি মাকড়সার আঁশের মতন উড়ছে। আঁচলটা গলার ওপর দিয়ে টেনে দিয়েছিল, তাতে কাঁধ অবধি ঢেকেছে, নগ্ন বাহু দুটির ত্বক পাকা পুষ্ট কলার মতন মসৃণ ও সুডৌল দেখাচ্ছিল, তেমনি স্বর্ণকান্তি। মালতী সন্ধ্যার চেয়ে উজ্জ্বল কিন্তু এখন রাত্রি জাগরণ ও মানসিক ক্লেশে মলিন। মালতী ক্রোধে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পেপার ওয়েটটা একবার সে তুলছিল, একবার নামাচ্ছিল। ওটাকে

সে এমন কঠিন মুঠোয় ধরে আছে যেন ওটা দিয়ে সে তার কোন নিষ্ঠুর সংকল্প সম্পন্ন করবে। ওর সমস্ত ভঙ্গীতেও যেন সেকথা সোচ্চার। ও আমাকে কিছু শক্ত কথা শোনাতে এসেছে। ওর সামান্য আনত চোখে চোখ রেখে আমি হাসলাম। হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা ধরলাম আমি। পেপার ওয়েটটা আলগা হয়ে আস্তে পড়ে গেল। সেই প্রথম দিন সন্ধ্যা যেমন করেছিল। মালতী আমার হাতে তার হাতটা পলকের জন্যে রাখতে দিল। আর সেই এক পলকে মালতীর সর্বাঙ্গ কয়েকবার কেঁপে উঠল, চোখ আর্দ্র হল মুখে ফুটে উঠল একটা যন্ত্রণার ছাপ ও তৎক্ষণাৎ সে হাতটা আমার হাত থেকে তুলে নিল। ওর চোখের আর্দ্রতায় ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ, বাঁকা ঠোঁটে বিদ্রূপ ফুটল। কিন্তু তক্ষুনি সে চোখ নামাল না কিংবা ছুটে পালাল না। আমার চোখের ভিতরে চেয়ে থেকে সে যেন কি দেখল, দেখছিল। দেখতে দেখতে তার চোখে নিষ্ঠুরতা ও স্নিগ্ধতা, রুক্ষতা ও আর্দ্রতা, ঘৃণা ও মমতা বুদবুদের মতন ক্রমাগত ফুটে উঠে মিলিয়ে যেতে সে সহসা অস্থির হয়ে দ্রুত পায় বেরিয়ে গেল। একটু পরে আমিও বেরিয়ে এলাম। আকাশ দেখলাম। বাতাসে শীতের দাঁতের ধার পরখ করলাম। দূরে জেলা বোর্ডের রাস্তা দেখা যাচ্ছে। কোথায় গেছে, কত দূর জানি না, আমি সে অজানার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

দুপুরে সূর্যশংকর একা ফিরে এলেন। তাঁর বন্ধুরা সূর্যশংকরের শুকদেবপুরের রেস্ট হাউস থেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেছে। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর যথারীতি তিনি আমাকে ও পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসলেন। আমার কাজ আশাতীত এগিয়েছে দেখে তাঁর খুব খুশি। আমি তাঁকে অনেকখানি পড়ে শোনালাম। তিনি মুগ্ধ হয়ে শুনলেন। শেষে আমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, ‘তোমার কৃতিত্বের তুলনা নেই শান্তনু, তুমি

এমন করে না লিখে দিলে আমি কখনো জানতাম না আমার অক্ষমতা কোথায়, আর কতখানি। যাও, শুয়ে পড়।'

সূর্যশংকর চলে গেলেন। আমি শুয়ে পড়লাম। আজ সারাদিন মনের মধ্যে যেন শুধু মালতীই পায়চারি করেছে আর ক্ষণেক্ষণে আমার দিকে তাকিয়েছে, আমি তার চোখে কেবল সেই বিপরীত ভাবের ক্রমাগত অভিব্যক্তি দেখেছি। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়তে আবার সেই বিবিধ বিপরীত ভাবের ক্রমান্বয় প্রকাশ চোখে পড়তে থাকল। কুমারী-মনের দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে এক আশ্চর্য রহস্য আমাকে অনুক্ষণ অবাক করে রেখেছিল। আমি এখনো অবাক হয়ে দেখছিলাম। ঘুম আসছিল না চোখে। পেঁচার ডাক শুনছিলাম। মাঝে মাঝে কুকুর ডেকে উঠছিল। নিকটে কোথায় একপাল শেয়াল ডেকে উঠল। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ডেকে উঠল দূরের, আরো দূরের শেয়ালের পাল। বহু দূরের শেয়ালের ক্ষীণ চিৎকার তখনও কানে আসছিল, শরীরে কোমল স্পর্শ অনুভব করলাম। হাত বাড়িয়ে টেনে নিলাম তাকে। সন্ধ্যা এসেছে। গন্ধে স্পর্শে আমি অন্ধকারেও তাকে চিনতে পারি।

আমার উরুর ওপরে সন্ধ্যার উরু, সে আমার শরীরে সংলগ্ন ও বুকে মাথা রেখে শুয়েছিল। রুদ্ধশ্বাসে উঠে বসল, 'কে?'

সন্ধ্যার পিঠে হাত রেখেছিল মালতী। আমি হাত বাড়িয়ে আমার শিয়রের জানলাটা ঠেলে দিয়েছিলাম। মধ্য রাত্রির আকাশে কোথায় একফালি মরা চাঁদ ছিল, তারই মলিন আলোয় দেখতে পেলাম, মালতী খাটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

বলল, 'দিদি শান্তনুর কাছে একলা তুমি কেন? হয় আমরা দুজনে শোব, নয়ত কেউ শোব না। আমাকে না শুতে দিলে আমি এক্ষুনি গিয়ে বাবাকে ডেকে তুলব।'

সন্ধ্যা সাড়া দিল না, আমি বললাম, 'বাবাকে ডাকতে হবে

না। এত বড় খাটে আমরা তিনজন অনায়াসে শুতে পারব, এস।' আমি ওর হাত ধরলাম। মালতী সে-ডাকে সাড়া দিল।

জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে সে আমার আর একপাশে এসে শুয়ে পড়ল। সে আমাকে দু'হাতে টেনে নিল তার বুকের মধ্যে। দু'পায়ে আমাকে বেষ্টন করে ধরল। সন্ধ্যার কাছ থেকে আমাকে সম্পূর্ণ কেড়ে এনে ক্রমাগত গালে গলায় ঠোঁটে চুমু খেতে লাগল। মালতী অসহ্য দাহে অস্থির হয়ে উঠেছিল। আর একটা মৃত শরীরের মতন নিশ্চল শক্ত হয়ে পড়েছিল সন্ধ্যা। যেন পরীক্ষা করছিল কত ধৈর্য তার, কতক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকতে পারে সে।

বুঝি পারল না, বেশীক্ষণ ধৈর্য রাখতে পারল না সন্ধ্যা। সে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'না মালতী এ হবে না। কিছুতেই হবে না, হতে পারে না। আমরা কেউ শোব না এখানে। তুমি উঠে এস।'

মালতী গ্রাহ্য করল না।

সন্ধ্যা সামান্য সময় অপেক্ষা করে বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

সন্ধ্যা চলে গেল।

মালতী তখন অন্য মানুষ।

হয়ত সন্ধ্যা মালতীর জন্যে অপেক্ষা করেছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে হতাশ হয়েছিল, ক্রুদ্ধ হয়েছিল। হতাশ ও ক্রুদ্ধ সন্ধ্যা মালতী যা করবে বলে শাসিয়েছিল, সে নিজেই তা করে বসেছে। বাপকে বলে দিয়েছে।

সকালবেলা। আমি সবে চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়েছি, একটা ভয়ংকর মুখ করে সূর্যশংকর ঘরে ঢুকলেন।

'চা রাখ। ওঠ।' তিনি তর্জনী তুলে আদেশ করলেন।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমি মনে মনে আগে থেকেই

প্রস্তুত ছিলাম। আমি তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালাম। গায়ে টুইলের শার্ট ছিল, পরনে ধুতি। চটি জোড়া খাটের নিচে আর সূর্যশংকরের দেওয়া শাল বিছানায় পড়েছিল। পড়ে থাকল। আমি নিলাম না।

'আমার সঙ্গে এস।' তিনি আগে আগে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে তাঁর পাশাপাশি হাঁটতে থাকলাম। আমরা দু'জনে নিঃশব্দে জেলা বোর্ডের রাস্তা পর্যন্ত এলাম। তখন সূর্যশংকর দাঁড়ালেন। আমার হাতে দশটাকার দশখানা নোট দিয়ে বললেন, 'তুমি আমার পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দিয়েছ বলে আমি তোমার কাছে ঋণী। তোমার বুদ্ধি, প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করেছে, তা না হলে তোমার মতন বেইমান কালসাপকে আমি কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিতাম। তোমার মতন মানুষের সে দশা আমার হাতে আরও কয়েকবার হয়েছে। যাও। এই ডিসট্রিকট বোর্ডের রাস্তা ধরে সোজা চলে যাও। কেবল সামনে হেঁটে যাবে। পেছনে তাকাবে না। পেছন ফিরবে না। কোনদিন যদি ফের এখানে তোমাকে দেখি, তোমার মৃত্যু জেনে রেখো।'

আমি আমার পেনসিল-কাটা ছুরিটার পকেটে টাকাটাও রেখে দিলাম। হাঁটতে থাকলাম আমি। কিছু সময় হেঁটে মনে হল, টাকাটা কোঁচার খুঁটে বেঁধে কোমরে গুঁজে রাখা নিরাপদ। আমি তাই করলাম। মাঘের সকাল। হাড় কাঁপিয়ে হাওয়া বইছে। গা গরম করতে খুব দ্রুত হাঁটছিলাম। অনেক দূর এসে পড়েছি, তখন পেছনে একখানা সাইকেলের শাঁ-শাঁ করে ছুটে আসার শব্দ শুনলাম। পেছনে তাকাইনি। সূর্যশংকরের আদেশে নয়, স্বভাবত। আমি যা পেছনে ফেলে আসি, পেছনে ফিরে তার দিকে আর তাকাই না। রাস্তার পাশে সরে

হাঁটছিলাম। সাইকেলটা আমার কাছে এসে থেমে গেল। সূর্যশংকর চৌধুরীর অন্দর মহলের চাকর। দু'চার বার দেখেছি তাকে। আমাকে নমস্কার করে খবরের কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট দিল।

'বড় দিদিমণি দিয়েছেন।'

প্যাকেটটা হাতে দিয়ে সে আর দাঁড়াল না। আমি পেছনে না তাকিয়েও বুঝলাম সাইকেলটি তীরের মতন বেগে ফিরে যাচ্ছে।

প্যাকেটটা হাতে করে আমি হাঁটছিলাম। ক্রমাগত হেঁটেছি। মাঘ-দুপুরের উজ্জ্বল ও উষ্ণ রোদ বিকেল না হতেই আর্দ্র ও বিবর্ণ হয়ে গেছে। হিলহিলিয়ে বইছে উত্তুরে হাওয়া। ধোঁয়ার মতন কুয়াশা উঠছে মাটি ফুঁড়ে। আমি তখন ভুবনগঞ্জের ঘাটে এসে পৌঁছেছি। নদীর পাড়ে পাট বেচা-কেনা হচ্ছে। খোঁটায় বাঁধা নৌকাগুলির গায়ে ছোট ছোট ঢেউ আছাড়পিছাড় খাচ্ছিল, ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে। জলের ধারে কাঠগোলার শালকাঠের ডাঁই। আমি একটা কাঠের গুঁড়ির ওপরে উঠে বসলাম। হাত বাড়ালে নদীর জল ছোঁয়া যায়। ছুঁয়ে দেখেছি হাওয়ার মতন ঠাণ্ডা না জল। হাত পা মুখটা, ঘাড় খুব ভাল করে ধুলাম। সারাদিনের পথ-হাঁটার না-খাওয়ার সব গ্লানি যেন উপে গেল। তখন প্যাকেটটা খুললাম।

এক পুঁটলি চিড়ে। একখণ্ড পাটালি গুড়। একখানা চিঠি। উলের একটি ফুল-হাতা সোয়েটার। সন্ধ্যাকে যে-দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছি, যে-বুকে মাথা রেখে সন্ধ্যা চোখ বুজে আদর খেয়েছে, এ সোয়েটার সে-হাত সে-বুক উষ্ণ রাখবে, সন্ধ্যার প্রেমের মতনই জড়িয়ে থাকবে আমাকে। আমি সোয়েটারটা গায়ে দিলাম। এক মুঠো চিড়ে গালে ফেলে এক কামড় গুড় মুখে নিয়ে চিঠিটা খুললাম।

প্রিয়তম,

আমার জীবনের প্রথম প্রেম তুমি, আমার জীবনের শেষ প্রেম। আমি আর জীবনে কাউকে ভালবাসতে পারব না। তুমি আমার সর্বস্ব সঙ্গে নিয়ে গেলে। আমি নিঃস্ব হয়ে পেছনে পড়ে রইলাম। আমি তোমাকে একা যেতে দিতাম না। আমিও তোমার সঙ্গে যেতাম। বাবা আর আমার বাঁধা ছিল না। তোমাকে ভালবেসে সংসারের আর সব বন্ধন তুচ্ছ হয়ে গেছে। তবু তোমার সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়তে পারলাম না পথে। আমি সারারাত ভেবেছি ; কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। পথের কষ্ট আমার সহ্য হবে না। অনাহার অর্ধাহার যত্রতত্র রাত্রিবাস, অসম্ভব। আমি যত ভেবেছি, তত শিউরে উঠেছি। আমার ভয়ের কাছে আমার প্রেম হার মেনেছে। হয়ত বংশ-মর্যাদার কাছেও। আমি আমার বাবাকে ছেড়ে যেতে পারি কিন্তু তাঁর উঁচু মাথা মানুষের কাছে হেঁট করে দিতে প্রাণে সইবে না। তাই প্রেমকেই বিদায় দিতে হল। কিন্তু তোমাকে বিদায় দিয়ে আমার কী থাকল ? কিছুই না। তোমার সামনে অবারিত পথ, মুক্ত জীবন। আমার সামনে অন্ধকার, চারধারে দেওয়াল। আমার সব থাকতেও কেউ রইল না। আমি আমার মধ্যে একাকী নিঃসঙ্গ নির্বাসিত হয়ে দিন কাটাব। তুমি জানতেও পারবে না, জান্‌লার গরাদে ধরে নিঃসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে তিলে তিলে কী কষ্টে একটি তৃষিত হৃদয় খাঁচার পাখির মতন বনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে শুকিয়ে মরে যাবে। ভালবাসা নাও। তুমি যেখানেই থাক, যে ভাবেই থাক, আমার ভালবাসা তোমাকে ঘিরে থাকবে।

তোমার সন্ধ্যা

চিঠিটা শেষ হয়েও যেন শেষ হয়নি। অকথিত আরো কত ব্যথা যেন তার মধ্যে লেখা দেখছিলাম। আমি চিঠিটার দিকে

তাকিয়ে ছিলাম। অন্ধকারে অক্ষরগুলি অস্পষ্ট হয়ে গেলে আমি আকাশে তাকালাম। মাঘের মলিন আকাশে কয়েকটি তারা মিটমিট করছে, মনে হল, কতকগুলি বিষণ্ণ নারীর ছলছলে চোখের চাহনি দেখছি। নদীর দিকে তাকালাম, জল, স্রোত কিছু চোখে পড়ল না শুধু কানে বাজছে একটানা এক করুণ কান্না, কোথা থেকে ভেসে এসে কোথায় চলে যাচ্ছে।

৫

হাপরের সামনে বসে আছে একটি লোক। একটি লোক একপাশে বসে হাপরের শিকল টানছে। শিকলের টানেটানে হাপরের মুখের অগ্নিকুণ্ড থেকে ক্ষ্যাপা গোখরোর মতন ফণা তুলে লকলকিয়ে উঠছে নীল শিখা। হাপরের সামনে বসা মানুষটি একটা লম্বা সাঁড়াশি দিয়ে সে-শিখার ভিতর থেকে তুলে আনছে রক্তবর্ণ তপ্ত লৌহখণ্ড, নেহাইয়ের ওপরে রাখছে। তু'টি লোক কখনো একজন নির্ভুল লক্ষ্যে সে তপ্ত লৌহখণ্ডের ওপরে প্রাণপণে হাতুড়ি মারছে, আর হাপরের সামনে বসা মানুষটি, ওস্তাদ, সে-প্রচণ্ড আঘাতের ফাঁকে ফাঁকে কি কৌশলে লৌহখণ্ডকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ধরছে, আর দেখতে দেখতে সে-লৌহখণ্ড হয়ে উঠছে খন্তা কুড়োল লাঙলের ফলা কিংবা আর কিছু। অবাক লাগছিল দেখতে। অসংখ্য কষ্ট আর যন্ত্রণার হাতুড়ি-পেটা হয়ে আমরাও একটা কিছু হয়ে উঠছি কি? কিংবা না, আমরা কিছু হয়ে উঠি না, কিছু হয়ে ওঠা আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ কোন এক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া; কিন্তু আমরা নিজের চেষ্টায় এগুতে পারি না। আমাদের জীবনের তুঃখগুলি সেই লক্ষ্যের দিকে আমাদের ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায়। আমাদের জীবনের কষ্ট যন্ত্রণাগুলির এজন্যেই প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য কি? কোন্ পথে কত দূরে গেলে সে লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে? ইত্যাদি ভবঘুরে জীবনের নানা চিন্তা যা যখন-তখন মনের মধ্যে ভিড় করে আসে, এখনও এসেছিল; কিন্তু ভিড় বাড়বার আগেই ঘুমে মাথা অবশ হয়ে এল। সকাল থেকে বিকেল

সারাদিন ক্রমাগত হেঁটেছি, কোথাও থামিনি, জিরোইনি, খাইনি। ক্লান্তির আর শেষ ছিল না। মাঘের শীত তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে কামারশালের হাপরের সামনে। আমি একটা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসেছিলাম। খুঁটিতে মাথা রেখে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই জানি না। ঘুমের ঘোরে খুঁটির গা থেকে পিছলে পড়ে যেতে জেগে উঠলাম। চেয়ে দেখি ভোঁ-ভাঁ কেউ কোথাও নেই। শুধু এই কামারশাল নয় গোটা হাটখোলাই নিষ্প্রদীপ জনশূন্য। আমি আগুনের কুণ্ডটার দিকে আরও একটু এগিয়ে বসলাম। হাপরের ফুসফুসে এখন আর হাওয়া নেই। আগুনের কুণ্ডটাও মুমূর্ষু, মনে হচ্ছিল ছাই গাদা—অনেক তলায় আগুনের আভাস লালচে দেখাচ্ছিল, নিঃশেষ হয়ে যেতে আর বেশী দেরি নেই। কিন্তু জায়গাটা তখনও খুব গরম। আমি সোয়েটারের ওপরে কাপড়ের খুঁট জড়িয়ে কুণ্ডর কাছে মাটিতে শুয়ে পড়লাম।

প্রথমে কয়েকটা কুকুরের ঘেউ-ঘেউ ডাক শ্বাসানির শব্দ কানে এসেছে, গুটি দু'তিন মানুষের ব্যস্ত কথাবার্তাও শুনতে পেলাম একটু পরে, শেষে মশাল হাতে একটি মানুষই এসে হাজির। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। আসলে আমি বেশীক্ষণ ঘুমোয়নি। আগুনের কুণ্ডটা নিভে গেলে মাটি আর কতক্ষণ গরম থাকে, আর মাটি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে সে মাটিতে কতক্ষণ শুয়ে থাকা যায়। মাঘের হাওয়ার বিরুদ্ধে সোয়েটারের সামর্থ্য আর কতটুকু! আমি হাঁটু বুক মাথা এক করে একটা বলের মতন হয়ে বসেছিলাম। মশালের আলো দেখে ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতন দাঁড়িয়ে পড়লাম। প্রথমে মনে হয়েছিল ডাকাত। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হবার আগেই অবাক হয়ে গেলাম। মশালটা এই কামারশালেরই ওস্তাদের হাতে। কিছুক্ষণ আগেও সে আশ্চর্য কৌশলে দা, কাঁচি, খন্তা, কুড়োল তৈরি করেছে। তখন তার মুখে কি কঠিন আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা দেখেছি। এখন, একি,

বিষণ্ণ হতাশ এবং ভীষণ অসহায়ভাবে মশাল হাতে এই মানুষটি কী করতে চায়?

'তুমি এখনও এখানে আছ?' লোকটি আমার মুখের সামনে মশালটা ধরে চিৎকার করে উঠল। শেষে বিড়বিড় করে বলল, 'বুঝতে পেরেছি তোমাকে ঈশ্বর এখানে পাঠিয়েছেন।' সে আমার হাত ধরে বলল, 'ভাই, আমার একটু উপকার কর।'

'নিশ্চয় করব।' আমি কাপড়ের খুঁট গা থেকে খুলে কোমরে বেঁধে ফেললাম।

সে বলল, 'এই মানুষটির সঙ্গে যাও। ও একা যেতে ভয় পাচ্ছে।'

মশালের পেছনে যে আর একটি মানুষ আছে এতক্ষণ দেখিনি। মশালের আলোটাই বাধা হয়েছিল বোধ হয়। এখন ঠাওর করে দেখলাম, এ সেই মানুষটি যে হাপরের শিকল টানছিল। বেশ জোয়ান, শক্ত সমর্থ, বুকে লোম ও প্রচুর দাড়িঅলা একটা মানুষ কোথায় যেতে ভয় পায় জানতে তার সঙ্গে রওনা হলাম।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'শ্মশানের কাছে কালীমন্দির, সেখানে।'

'কেন?'

'দাই ডাকতে।'

'কামারশালে আরও দুটি মানুষ দেখেছি, যারা হাতুড়ি মারছিল, তারা কোথায়?'

'বাড়ি চলে গেছে।'

'তোমরা কামারশালের পেছনেই থাক নাকি?'

'না। আরও ভিতরে। সুপুরি-নারকেলের বন আছে, সেখানে টিনের ঘর।'

আমরা দাই নিয়ে সেখানে এলাম। উঠোনে একটা হোগলা-পাটির ওপরে পড়ে ছট্‌ফট্ করছিল একটি বউ।

ওস্তাদ আমার হাতে মশাল দিয়ে বলল, 'তুমি এটা ধরে থাক।' সেই শিকলটানা লোকটিকে বলল, 'বংশী তুইও থাক, যদি কিছু চায় দরকার পড়ে এনে দিবি।'

ওস্তাদ একমুখ ভয় ও অবসন্নতা নিয়ে ঘরে চলে গেল।

বংশী বলল, 'এ বউ ওর দ্বিতীয় পক্ষ। প্রথম পক্ষও ছেলে হতে গিয়ে মরল কিনা তাই এত কাতর হয়ে পড়েছে মানুষটা।'

সন্তান কেমন করে হয়? মশাল হাতে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছিলাম। এ আমার এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। আমার চোখে পলক ছিল না। আমার সতর্ক ও উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি যুবতী বউটির মুখের ওপরে স্থির হয়েছিল।

প্রসব-বেদনায় কাতর বউটির মুখে যন্ত্রণার রেখাগুলি দেখছিলাম। মনে হল রমণকালে পরম সুখের মুহূর্তে আমার বুকের নিচে নারী-মুখে যে সব রেখা, চিহ্ন পুনঃপুন ফুটে উঠতে মিলিয়ে যেতে দেখেছি, এই পরম যন্ত্রণার রেখা ও চিহ্নগুলির সঙ্গে তার একবিন্দু পার্থক্য নেই। সেই একই রেখা একই চিহ্ন একই থরথর কম্পন সর্বাঙ্গে। পার্থক্য যদি কিছু থাকে সে মাত্রার— পরম সুখের চেয়ে পরম যন্ত্রণার রেখা, চিহ্ন, কম্পন বেশী গভীর বেশী স্পষ্ট। তবে কি সুখ দুঃখ একটি বোধেরই বিপরীত অভিব্যক্তি, আনন্দ বেদনা হিংসা রিরংসা ইত্যাদি একই বোধের বহুধা প্রকাশ? হাটখোলার অশ্বত্থ গাছটা মনে পড়ল। যে-গাছটা তার সহস্র শাখা-উপশাখায় পল্লবে গোটা হাটটার আধখানা ছায়া করে রেখেছে তার গুঁড়ি কিন্তু একটি। একটি গুঁড়িই ঊর্ধ্বে উঠে সহস্র শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। তেমনি আমাদেরও মূলে বোধ একটি-ই। একটা সত্য, একটা মহৎ সত্য যেন আমার চোখের সামনে উন্মোচিত হল। আমি শিউরে উঠলাম। চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিল যেন ভেসে উঠল। জন্মের দিন থেকে মানুষ যাত্রা করেছে এই লক্ষ্যের দিকে, মৌল

বোধে গিয়ে পৌঁছনোই তার লক্ষ্য। হয়ে-ওঠা নয়, মানুষ হয়ে-ওঠে না। সে কেবল চলে।

দাইয়ের দু'হাতে শিশুটির মাথা। কি সুন্দর একমাথা কালো কুচকুচে চুল, পদ্মের পাপড়ি মতন রং কচি মুখ, ছোট্ট টিকলো একটি নাক, বুজন্ত দু'টি চোখ, দুটি ঠোঁট, চিবুক, অপূর্ব একটি পুতুল দেখে অবাক লাগছিল। পুতুলটি অল্পে অল্পে বেরিয়ে আসছিল মায়ের পেট থেকে। দাই দু'হাতে তাকে ধরে নিল। তখনও শিশুটি কাঁদছে না। নড়ছে না। যেন জীবন্ত মানুষ নয়, সত্যিকার একটি আলুর পুতুল। একটা দড়ির মতন নাড়ি দিয়ে মায়ের শরীরের সঙ্গে বাঁধা। দাই একটা বাঁশের ছুরি দিয়ে সেই নাড়িটিকে কেটে দিতেই শিশু চিৎকার করে উঠল। আমি চমকে উঠলাম। মায়ের সঙ্গে মৌল বোধে আমরা যতক্ষণ যুক্ত থাকি আমরা সুখী; ছিন্ন হয়ে গেলেই দুঃখ। আমরা কেঁদে উঠি। সারাজীবন কাঁদি, কান্না ভুলতে সুখ খুঁজে বেড়াই। মৌল বোধে পৌঁছতে না পারা পর্যন্ত সুখী হতে পারি না।

ওস্তাদের বড় আনন্দ তার ছেলে হয়েছে। বউও বেঁচে আছে।

ভোর হতে না হতে সে হৈচৈ করে গয়লাকে তুলে দৈ নিয়ে এল। চিড়ে গুড় বের করল। আমাকে আর বংশীকে পেট পুরে খাওয়াল ওস্তাদ।

আমার মাথায় হাত রেখে ওস্তাদ বলল, 'তুমি বড় পয়মন্ত ছেলে। খেতে পরতে দেব। কিছু হাত-খরচা দেব। কাজ শিখলে তখন মাইনে দেব। তুমি আমার কাছে থাক।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে তাল তাল উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড কাস্তে খন্তা কুড়োল লাঙলের ফলা হতে থাকল। আমি রাজি হয়ে গেলাম। কী কৌশলে ওস্তাদ ঈশ্বরের মতন কাণ্ডটি করে জানতে আমার বড় কৌতূহল।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বুঝলাম এ আমার কাজ নয়। আমি আমার মনের যে মৌল বোধকে আকৃতিতে রূপ দিতে চাই হাতুড়ি মেরে তা কখনো হবে না। কলম চাই কাগজ চাই। অথবা কাঠ কি মাটি। অবসর সময়ে নরুন দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে কথাটা আমার মনে হয়েছে। নরুনের ধারাল ফলায় মাটি সরে সরে গিয়ে হঠাৎ হঠাৎ আশ্চর্য সব মূর্তি ফুটে উঠত। আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকতাম। এসব অসম্পূর্ণ মূর্তিগুলি স্বপ্নে আমাকে হানা দিত, যেন সম্পূর্ণ হতে চাইছে।

বংশী একদিন দেখে বলল, 'বাঃ সুন্দর ছবি আঁকতে পার ত। কাগজে এঁকে দাও, বাঁধিয়ে রাখব।'

চাষা-ভুষোর হাট। এখানে কাগজ যদি বা পাওয়া যায় রং তুলি কি আঁকবার পেনসিল নেই।

বংশী বলল, 'মেলায় পাওয়া যাবে। মেলায় হেন জিনিস নেই আসে না। খেমটা বাঈজী সারকাস ত আছেই, ইস্তক ম্যাজিক বায়স্কোপ মাইক। মাইক জান, হাটের ও-মুড়া থেকে কথা কইলে গান গাইলে এ-মুড়ো থেকে শোনা যায়। মেলায় মাইক লাগিয়ে যাত্রা গান হয়।'

'কোথায় মেলা, কিসের মেলা?'

'পীর গোরাচাঁদের গো, দাঁড়াও।'

বংশী হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল। একটু পরেই ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। 'জেনে এলাম মাসির কাছ থেকে, ফাল্গুনের সাতাশ তারিখে পূর্ণিমা। সেদিন থেকে মেলা বসবে, যাবে নাকি?'

'নিশ্চয়।' যেন তক্ষুনি রওনা হচ্ছি এমন ভাবে উঠে দাঁড়ালাম। আমার আর একদিনও এখানে ভাল লাগছিল না।

বংশী হেসে ফেলল, 'মেলার নামে তুমি এক্ষুনি যে রওনা হলে! ফাল্গুনের সবে তিন না চার আজ।'

বড্ড দমে গেলাম। একটা মেলার স্বপ্ন আমার সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন করে রইল। একটা হৈচৈ আনন্দের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে আমার আর তর সইছিল না।

তবু অপেক্ষা করতে হচ্ছে, অপেক্ষা করছিলাম, শেষ পর্যন্ত বাদ সাধল বংশীর মা। আমরা রওনা হব তার আগের দিন বংশীর গাঁ থেকে খবর এল, তার মায়ের ওলা হয়েছে। বংশী তক্ষুনি রওনা হয়ে গেল দেশে।

আর আমি গাজীর চকের দিকে হাঁটতে থাকলাম।

গাজীর চক সাত ক্রোশ, শুধু এটুকু জানি, কোন পথে কোথা দিয়ে যেতে হবে কিছু জানি না। জেলাবোর্ডের লম্বা চওড়া কোন সোজা রাস্তা কোথাও নেই। লোকালবোর্ডের সরু রাস্তা কখনো গাঁয়ের ভিতর দিয়ে কখনো মাঠের মধ্যে দিয়ে কখনো বা নদীর পাড় ধরে কার মর্জি মতন কোথায় যে গেছে কেউ জানে না। অগত্যা যখন যাকে পথে পাই জিজ্ঞেস করি, যে যেদিকে যেতে বলে যাই। ঠিক পথে যে যাই না, তা টের পেলাম বিকেলে। আমি যখন রওনা হয়েছি তখন থেকে ঠিক পথে হাঁটলে এখন আমার মেলায় পৌঁছে যাবার কথা, কিন্তু এখনও আমি পথে, এখনও নাকি তিন ক্রোশ দূর।

যে মানুষটি আমাকে এ খবরটি দিল একটু আগে সে আমার সঙ্গ নিয়েছে। সে আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল।

'গাজীর আস্তানায় সিন্নি দিতে যাচ্ছ, নাকি মেলায় মজা লুটতে?'

'আমি কিছু কাগজ কিনব তুলি আর রং।'

'তুমি বুঝি পটুয়া?'

'না। পটুয়া হব, পট আঁকতে শিখব।'

'শিখবে? কে শেখাবে তোমাকে? গুরু কে?'

'গুরু নেই।'

‘দেখ, গুরু না ধরলে কিছু শেখা যায় না। যা-ই শেখ একজন গুরু চাই।’

আমার সৌম্য-দর্শন প্রবীণ মাস্টারমশায়ের কথা মনে পড়ল। তার শিক্ষকতার গুণে অল্প সময়ে আমি অনেক শিখতে পেরেছি, ভাল করে শিখতে পেরেছি। চিত্রকর রূপকার হবার জন্যে তেমন একজন শিক্ষক সত্যি ত আমার দরকার।

‘তোমার জানা আছে কেউ ?’

‘আছে না আবার, কংসারি পালই ত আছে। যার নাম করলে এ অঞ্চলের সব পটুয়ারা মাথা হেঁট করে।’

‘তিনি কি মূর্তি গড়েন ?’

‘হুঁ, শুধু ঠাকুর দেবতা নয়, যে কোন মূর্তি তিনি গড়েন, আর শুধু মূর্তি নয় সে। মূর্তির মুখে যে ভাব ফুটোতে বলবে হিংসা ক্রোধ আনন্দ, জীবন্ত হয়ে উঠবে।’

‘আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাও না।’

‘শিষ্য হতে হলে যে গুরুদক্ষিণা দিতে হয়—এক পাইট ধেনো আর একটি মেয়ে মানুষ—অন্তত দশটা টাকা।’

‘দেব।’

‘আর আমাকে খাওয়াবে না ?’

‘খাওয়াব।’

‘ফুরতিটুরতির জন্যে ?’

‘টাকা দেব।’

দশটাকার দশখানা নোট আমার কোমরে বাঁধা। আমি অনায়াসে কথা দিলাম।

কথা বলছিলাম আর হাঁটছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে মাঠ ক্ষেত ছাড়িয়ে আমরা এক গ্রামের কাছে এসে পৌঁছলাম। পূর্ণিমার চাঁদ তখন আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে। আকাশ জমি জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করছে। আলো না যেন রুপোর জল,

আমরা হাঁটছি না যেন সাঁতার কাটছি। বাতাসে শীত-শীত ভাব, তার ওপরে একজন সহৃদয় সঙ্গী পেয়েছি, হাঁটতে বেশ ভাল লাগছিল।

'এভাবে হাঁটলে আমরা আর কতক্ষণে গিয়ে মেলায় পৌঁছব ?'

'তা মাঝরাতের আগে ত না। অবশ্য তার বাকিও বড় নেই। কিন্তু এত রাতে পথ হাঁটা ঠিক হবে না হে, এ অঞ্চলে বড় শেয়ালের উপদ্রব। তাছাড়া মেলা উপলক্ষে ভালমানুষ যেমন চোর ডাকাত বদমাসও তেমনি চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে। তারা যদি কেউ আমাদের সঙ্গ নেয়, টের পায় আমাদের সঙ্গে টাকাকড়ি আছে মুশকিলে পড়ে যাব।'

'কিন্তু থাকব কোথায় আমরা ?'

'সামনে যখন গ্রাম রাতটুকু কাটাবার মতন একটু জায়গা খুঁজে পাবই, এস।'

গ্রামে ঢুকবার মুখে একটা ছোট্ট পড়ো-পাকাবাড়ি পড়ল। দরজা জানালা ভাঙা, ইট পলেসতারা খসা বাড়িটার আধখানা দেওয়াল জুড়ে মস্ত এক অশ্বত্থগাছ। বাড়িটা দেখিয়ে মানুষটি বলল, 'এস না, এখানেই থেকে যাই রাতটুকু। আর ত ক্রোশ দুই পথ, ভোরে উঠে চলে যাব।'

সে একটা টাকা চাইল। এ গাঁ তার চেনা। দৈ-চিড়ে কোথায় পাওয়া যায় সে জানে। নিয়ে আসবে।

ওস্তাত আমাকে মেলায় খরচ করতে পাঁচটা টাকা দিয়েছিল, সে খুচরো টাকা ক'টা পকেটে রেখেছিলাম, কোঁচরের টাকায় আর হাত দিতে হল না, ওর থেকেই একটা টাকা দিলাম। যাওয়ার আগে সে ঘরের ভিতরটা দেখে এল।

'মেঝেতে কোন নোংরাটোংরা নেই, বেশ তক্‌তকে পরিষ্কার, খুব আরামে ঘুমনো যাবে হে, শেয়াল বদমাসেরও ভয় থাকবে না। দরজা আছে। ভেজিয়ে দিতে পারব।'

সে শিস দিতে দিতে চলে গেল। আমি বসে পড়লাম। দীর্ঘ দূর পথ একটানা হেঁটে আসার পরে একটু বসতে পেয়ে শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। একটু পরেই অবসাদ নেমে এল শরীরে। ঘুমে চোখ বুজে-বুজে আসছে।

'কৈহে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?' এক সময়ে ডেকে উঠল লোকটি।

আমি চমকে উঠে সোজা হয়ে বসলাম। 'না এইত বসে আছি।'

সে নিকটে এল। 'গয়লা এত দৈ-চিঁড়ে গুড় দিল যে দু'জনে সাবড়ে উঠতে পারব না, ছ্যাখ।'

দেখলাম। সত্যি অনেক। কিন্তু ক্ষুধাও কম ছিল না। চেটেপুটে সব খেয়ে উঠলাম দুজনে। তারপর দুজনে এসে ঘরের মধ্যে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লাম, দরজা এঁটে দিলাম ভাল করে। ভরপেট ক্লান্ত অবসন্ন শরীর। শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছি।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কিছুতে যেন গলাটা টিপে ধরেছে আমার। হাত দিয়ে সরাতে গিয়ে টের পেলাম, লম্বা দাঁড়ার মতন সরু শক্ত দশটা আঙুল। মানুষটা আমার পেটের ওপরে বসে আছে। তার মতলব ছিল বুঝি ঘুমের মধ্যেই আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে। আমি জেগে গেছি দেখে এখন সে এক হাতে আমার গলাটাকে প্রাণপণে টিপে ধরে আর এক হাতে আমার কোঁচার খুঁট খুলে ফেলল। আমাকে বেকায়দায় রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকাটা হাতাতে চাইছে সে। ডাকাত বদমাস যে আশেপাশে নয় আমার সঙ্গেই এতক্ষণ ছিল এখন বুঝতে পারলাম এবং মুক্তির জন্যে সব শক্তি এক করে ওর একটা আঙুল মুচড়ে ধরলাম, লোকটা একটা অস্ফুট যন্ত্রণার শব্দ করে হাতটা শিথিল করতেই

কনুইয়ের প্রচণ্ড চাপ দিয়ে আমার ওপর থেকে ওকে ফেলে দিলাম। লোকটা ভীষণ বলশালী। সে আমার ওপরে বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা মৃত্যুপণ লড়াই সুরু হল আমাদের মধ্যে। সব সময় আমি আমার পেনসিলকাটা ছুরিটার কথা ভাবছি। ওটা একবার যদি কোন মতে পকেট থেকে বের করতে পারি বেঁচে যাব হয়ত; কিন্তু ওর হাতে গিয়ে পড়ে যদি —যদি জানে আমার পকেটে ছুরি আছে, কেড়ে নিতে পারে, মৃত্যু অনিবার্য। সেই অনিবার্য মৃত্যুর সম্ভাবনা সামনে করে আমার চেয়ে বয়সে বড় আকারে বড় শক্তিতে বড় মানুষটার সঙ্গে লড়ছিলাম। এক সময়ে ওকে আমি কোথায় কামড়ে ধরেছিলাম। ও আমাকে লাথি মেরেছিল, আমি ছিটকে পড়ে গিয়েছি। আমি কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়েছি অন্ধকারে ও তক্ষুনি টের পায়নি। আমি দু'পাটি দাঁতের মধ্যে আমার অসহ্য যন্ত্রণা ও ফুরিয়ে-যাওয়া দম শ্বাসকষ্ট চেপে রেখে পকেট থেকে ছুরিটা বের করতে পেরেছি তখন ডাকাতটা আবার আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা ওর মাংসে বসিয়ে দিয়েছি। ও একটা যন্ত্রণার চিৎকার করে সরে যেতে আমি ওর ওপরে লাফিয়ে পড়লাম। ওর বুকে চেপে বসলাম এবং শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে ওর গলায় বসিয়ে দিলাম ছুরিটা। কয়েকবার গোঁ গোঁ শব্দ করে চুপ হয়ে গেল সে। আমি তার বুক থেকে উঠে দাঁড়ালাম। ভাঙা দরজাটা খুলে ফেললাম টান মেরে। পশ্চিম আকাশে হেলে-পড়া চাঁদের আলো এসে ঘর ভরে দিল। সে আলোয় তাকে দেখি। মনেই হয় না লোকটা খুন হয়ে পড়ে আছে, লাস, যেন ঘুমুচ্ছে, মুখে প্রগাঢ় ঘুমের শান্তি।

আমার জামার বুকের অংশটা ভিজে সপসপ করছিল, মনে হল রক্তে আমি নেয়ে উঠেছি। এটা গ্রাম। ভোর হলে লোক

জাগবে। আমাকে রক্তাক্ত দেখবে। হৈচৈ উঠবে চারধার থেকে আর পালাতে পারব না। মনে আছে এ বাড়িতে আসবার পথের ধারে একটা পুকুর দেখেছিলাম। আমি এসে তার জলে নেমে পড়লাম। নোটগুলি ট্যাঁক থেকে খুলে পাড়ে রেখেছি। এখন আর ও-টাকায় যেন মায়া নেই। ও-টাকাই আমায় মৃত্যুর কারণ হয়েছিল বলে এখন আর যেন ও-টাকা আমি ছুঁতে চাইছি না। ভাল করে স্নান করলাম, জামা কাপড় ধুলাম, ওপরে উঠে এসে কাপড়টা নিংড়ে নিয়ে পরলাম। জামাটা কাঁধে ফেলে নিলাম। তখন মনে হল, লোকটা মিথ্যেবাদী ডাকাত হতে পারে কিন্তু কংসারি পাল বলে কোন বিখ্যাত মৃৎশিল্পী থাকা অসম্ভব নয়। যদি থাকে টাকাটা সব তাঁর পায়ের কাছে রেখে আমি তার শিষ্য হব। টাকাটা তাই আবার কোঁচার খুঁটে বেঁধে নিলাম।

গ্রাম থেকে আমি মাঠে নেমে এলাম। সূর্য উঠবে, উত্তাপ বাড়বে, আমার জামা-কাপড় শুকুলে আমি মেলার পথে হাঁটব। দু'ক্রোশ দূর—মাত্র ত এক ঘণ্টার রাস্তা।

খুব সাবধানে মানুষজনের নজর এড়িয়ে নদীর পাড় ধরে হেঁটেছি। মেলায় এসে পৌঁছলাম সন্ধ্যার সময়। ইচ্ছে করেই রাত করেছি। রাতের অন্ধকার না থাকলে জামা-কাপড় দেখে সন্দেহ হতে পারে মানুষের।

কিন্তু মেলায় অন্ধকার কোথায়! আলোয় আলোময় চারদিক—কোথাও পেট্রোমাক্স কোথাও কারবাইড, কোথাও মশাল-ডিবে। হারিকেন লণ্ঠন কেরসিনের কুপিও আছে। আমি সর্বপ্রথমে জামাকাপড় কিনলাম। টাকাটা রাগ করে পুকুর পাড়ে ফেলে আসিনি বলে নিজেকে প্রশংসা করলাম। মেলা ছাড়িয়ে দূরে অন্ধকারে গিয়ে খুনের চিহ্ন ছেড়ে ফেলে দিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে এলাম। এখন মেলা দেখব।

এবং দেখতে দেখতে মেলার ভিড় ও আনন্দের মধ্যে ডুবে গেলাম। বংশী ঠিকই বলেছিল। সব আছে এই মেলায়। গোটা ছুনিয়ার সব সুখ আনন্দ এসে উৎসব করতে জড়ো হয়েছে এই পীরের আস্তানায়।

থরেথরে দোকান। বেলোয়ারি, মুদী-মশলা, কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন, মনোহারি—নেই হেন জিনিসের দোকান নেই। সাজানো-গোছানো কী চমৎকার শেষে পেট্রোমাক্সএর আলোর জেল্লা; চোখ ঝলসে দিচ্ছিল। দলে দলে মানুষ যাচ্ছে আর দোকানীরা চেঁচিয়ে উঠছে, 'আসুন, দেখে যান, কী চাই আপনার?' ছু'পাঁচটা দশটা দোকানের পরেই একটা করে গলি। আড়া-আড়ি, কোণা-কোণি, সোজাসুজি নানা গলি ঘুঁজি। টেরা-বেঁকা সে-গলি-ঘুঁজিও যেন মেলার আর এক মজা। মস্ত এলাকা নিয়ে এক ইলাহী ব্যাপার। কোথাও খোল-কর্তাল হারমোনিয়ম বাজছে কোথাও বেহালা বাঁশি তবলা যেন পালা গান হচ্ছে এক জায়গায়, আর এক জায়গায় যাত্রা মতন কিছু। এক দোকানে মাইক বাজছে। বংশীর সেই এ-মুড়োয় বাজলে ও-মুড়ো থেকে শোনা যায় যন্ত্রের প্রাণপণ চিৎকারের নিচে সেখানকার আর সব হৈ-চৈ চাপা পড়ে যাচ্ছে। মাইক ছাড়িয়ে এসে শুনতে পেলাম ড্রামের শব্দ, দূরে কোথায় ইংরাজি বাজনা বাজছে। বাজনা লক্ষ্য করে চোখ তুলতে একটা তীব্র আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে চলে গেল। এক বিরাট তাঁবুর ওপরে বাতিটা ঘুরছে। একটা এন্‌জিনের একটানা আওয়াজও কানে এল। ডায়নামো।

ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় চোখে পড়ল, এক ময়রা ফুটন্ত বাদাম তেল থেকে জিলিপি তুলে তুলে চিনির ঘন শিরার মধ্যে ফেলছে। অমনি জিলিপির তেলেভাজা তপ্ত শরীর ছ্যাঁক করে উঠে নিমেষে ঠাণ্ডা রসে স্নিগ্ধ ও টুসটুসে হয়ে যাচ্ছে। ভারি লোভ হল, বসে পড়লাম তার দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চিখানাতে।

চারখানা কিনলাম। কলা পাতায় করে দোকানী আমার হাতে দিল। তখনও গরম। জুড়ানোর অপেক্ষায় এদিক ওদিক দেখছিলাম।

ময়রার পাশে এক ফুলুরির দোকান। ফুলুরি বেগুনি আলুর চপ সব আছে দোকানে। সেখানেও ফুলুরি ভাজা হচ্ছে। এক ঝাঁক ছেলে-মেয়ে এসে অনেকগুলি ফুলুরি কিনে খেতে খেতে চলে গেল। আর এক ঝাঁক এসেছে ময়রার দোকানে। তারা জিলিপি কিনল। সন্দেশ রাজভোগও কিনল কেউ কেউ। তাছাড়া একজন দু'জন করে আসতে কামাই যাচ্ছে না দু'চার মিনিটও।

আমি একটা জিলিপি ভেঙে মুখে দিয়ে বললাম, 'মেলা বেশ জমেছে, না ময়রা ভাই?'

'কই আর জমল!' চিমটে দিয়ে জিলিপি তুলতে তুলতে ময়রা বলল, 'দুপুর বেলা কিছু জমেছিল এখন ত ভোঁ ভাঁ ফাঁকা। সে চিমটের জিলিপি শিরায় ফেলে ঝাজরি হাতা দিয়ে চাপা দিল।

ক্ষণেক্ষণে খদ্দের আসছে তবু ময়রা বলছে ফাঁকা! শুধালাম, 'দুপুরের মানুষ কোথায় গেল, সব বাড়ি চলে গেছে?'

'কেউ গেছে। কেউ, ওই যে দেখছ আলো, ক্ষণেক্ষণে চমক দিয়ে যায়, ওখানে ভিড় করেছে। সার্কাস হচ্ছে কিনা।'

'মেলা জমবে কাল।' ফুলুরিঅলা উনুন থেকে কড়া নামাতে নামাতে বলল। অনেকক্ষণ থেকে ওর খদ্দের নেই। ওর পরাতে অনেক পিঁয়াজের বড়া আলুর চপ ফুলুরি টাল হয়ে আছে।

'শুনছ, মহিম খুড়ো?' ময়রার নাম মহিম। সে সাড়া দিল। ফুলুরিঅলা বলল, 'কালীগঞ্জের অপেরা পার্টি কাল 'ময়ুর সিংহাসন' পালা গাইবে।'

'এত মানুষজনের ভিড়, এত আয়োজন উত্তেজনা কেন হয়, রহস্যটা কি?' আমার বড় কৌতূহল হল।

ফুলুরিঅলা অবাক, 'বলি তুমি কোন দেশের মানুষ হে, এখান

থেকে পনর বিশ মাইল যে দিকে যাও, এ পীরের আস্তানা এক ডাকে চিনবে সবাই।'

ময়রা বলল, 'শুধু শুধু আর চেনে না, রাসু! এমন হাজারটা পীরের দরগা, আস্তানা আছে। জঙ্গল হয়ে আছে, ভেঙেচুরে আছে, কেউ জানে না চিনে না। অথচ কত দূর দূরের মানুষ বুড়া গুড়া যুবতী বউ মেয়ে নিয়ে রাস্তা চিনে চিনে এখানে আসছে। নৌকোয় আসছে, গোরুর গাড়িতে আসছে, এমন কি হেঁটে পর্যন্ত।

'কেন আসে?'

'মাহাত্ম্য আছে।' এ পীরের নামে সিন্নি মানত করলে মানুষের রোগ শোক দূর হয়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।' ময়রাও এবার তার তেলের তাওয়া উনুন থেকে নামাল। আমি আরও দু'খানা গরম জিলিপি নিলাম।

'শুধু জিলিপিই খাবে, ফুলুরি খাবে না?' রাসুর ফুলুরিগুলি পেতলের পরাতে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তাই বুঝি ওর এই খেদোক্তি।

বললাম, 'দাও, দুটো ফুলুরিও খাই।

ময়রা গামছা দিয়ে গা মুছছিল, তার মাথায় তখন পীরের গল্প, বলল, 'সেকি আজকের কথা, বালাণ্ডা পরগণার রাজা তখন চন্দ্রকেতু। গোরাচাঁদ যাচ্ছিলেন তাঁর রাজধানী দেউলিয়ায় দরবার করতে। সেদিনও এই পূর্ণিমা তিথি, ফাল্গুন মাস। ভর দুপুর। মরা ছেলের মাথা কোলে করে বসে আছে মা। বিধবার একমাত্র সন্তান। সংসারে তার আর কেউ নেই। পথশ্রান্ত গোরাচাঁদ পর্ণকুটিরের দুয়োরে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন, 'মা কই গো, ছেলেকে একটু জল দাও।'

কে তার ছেলে?. কে তাকে মা বলে ডাকে? তার ছেলে, তাকে মা বলে ডাকার মানুষটি ত তাকে ফেলে জন্মের মতন চলে গেছে। মরা ছেলের মাথা কোল থেকে নামিয়ে অভাগী

এসে দাওয়ায় দাঁড়াল। মুখে কথা নেই। চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে শুধু।

সেই শোকের পাথর-মূর্তির দিকে তাকিয়ে গোরাচাঁদ শুধোলেন, 'কী হয়েছে মা তোর?'

মা কিছু বলতে পারছে না। সে ঘরের ভিতরে তাকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল।

'আয় দেখি মা, কী হয়েছে, দেখি।' মাকে নিয়ে তিনি কুটিরে ঢুকলেন। মৃত ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাঁদিস নে মা, আমি তোর ছেলেকে বাঁচিয়ে দেব।'

গোরাচাঁদ মৃত ছেলের মাথায় হাত বুলোলেন একবার, সর্বাঙ্গে তিনবার ফুঁ দিলেন।

যারা বাঁশ দড়ি কাঠ খুঁটো খন্তা কুড়োল জোগাড় করতে গিয়েছিল তারা শবদাহের সব একত্র করে নিয়ে এসে অবাক। দেখে, এক দিব্যকান্তি সৌম্য পুরুষের পদতলে পড়ে আছে রাখালের মা। আর রাখাল ওদের দিকে মিটিমিটি তাকাচ্ছে।

গোরাচাঁদ তিন রাত্রি সেই কুটিরে বাস করেছিলেন। সেই থেকে সেই কুটির হল গোরাচাঁদের আস্তানা, আশ্রম। গুণে মাহাত্ম্য বাড়ে বলে সে তিন দিনকে তিন দিয়ে গুণ করে ন'দিন ধরে মানুষ তাদের সারা বছরের মানত এনে পীরের আস্তানায় প্রার্থনা করে। সে উপলক্ষে ন'দিনের মেলা এখানে।

'অনেককে বলতে শুনলাম। বলে গোরাই গাজীর আস্তানা। গাজী কেন বলে?' আর একটা গল্প আছে, থাকতে পারে সন্দেহ করে প্রশ্ন করলাম।

সে সন্দেহ মিথ্যে হল না।

'গাজী মানে বীর।' এবার গল্প সুরু করল রাসু। নাম হিঁদুর মতন আসলে গোরা গাজী কিন্তু মুসলমান। গিয়েছিলেন সুন্দরবন অঞ্চলে হাতিয়াগড় রাজ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে। রাজা

মহীদানন্দের ছেলে প্রবল প্রতাপ যুবরাজ বকানন্দর সঙ্গে তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হল। তাতে যুবরাজ বকানন্দ নিহত হলেন। গোরাচাঁদও রেহাই পেলেন না। তখনই মরলেন না বটে কিন্তু শরীরে অস্ত্রাঘাত পেয়েছিলেন প্রাণান্তিক। তিনি কোনমতে পালিয়ে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। কালু ঘোষ নামে এক গয়লার গোরু রোজ গিয়ে তাঁর মুখে দুধ ঢেলে দিয়ে আসত। এভাবে লোক-চক্ষুর অগোচরে যদি সাত দিন দুধ খেতে পারেন গোরাচাঁদ তবে তিনি বেঁচে উঠবেন, এই ছিল দৈববাণী। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। তার গোরু গভীর জঙ্গলে রোজ কোথায় যায় দেখতে কৌতূহলী কালু ঘোষ সাতদিনের দিন এসে হাজির গোরাচাঁদের সামনে। আর বাঁচবেন না। বাঁচার আশা নেই বুঝে তিনি কালু ঘোষকে অনুরোধ করলেন তাঁকে হাড়োয়ায় নিয়ে কবর দিতে। তাই দিয়েছিল কালু ঘোষ। কিন্তু হিঁদু হয়ে মুসলমানকে কবর দেওয়ার জন্যে কালু ঘোষের এক প্রতিবেশী নিত্য তাকে বিদ্রূপ করত। রেগে গিয়ে কালু ঘোষ একদিন তার মাথায় বাড়ি মেরে বসল। হত্যার অপরাধে ধৃত হল কালু ঘোষ। গৌড়ের শাসনকর্তা আলাউদ্দীনের কাছে নিয়ে আসা হল তাকে। এদিকে কালু ঘোষের বউ গোরাচাঁদের কবরের ওপরে হত্যা দিয়েছে। নাওয়া নেই খাওয়া নেই একবারটি উঠছে না পর্যন্ত, কেবল কাঁদছে আর বলছে, 'আমার স্বামীকে বাঁচাও।' ওদিকে আলাউদ্দীনের দরবারে বিচার হচ্ছে কালু ঘোষের, হঠাৎ আলাউদ্দীন দেখেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁর সামনে। তিনি আর কেউ নন, গোরাচাঁদ স্বয়ং। গোরাচাঁদের আদেশে আলাউদ্দীন তাকে শুধু মুক্তি দিলেন না অনেক জায়গীর আর উপঢৌকনও দিলেন। বকানন্দকে ধর্মযুদ্ধে নিহত করেছিলেন বলে মুসলমানরা তাঁকে বলে গাজী।

'সেই কালু ঘোষের ব্যাপারটা কিন্তু আজও চলছে।'

এতক্ষণে আমার চমক ভাঙল। খেয়ালই করিনি গল্প শুনতে এত এত লোক জমেছে। আর গল্প বলতে বলতে কখন যে রাস্থ তার ফুলুরির পরাত শূন্য করেছে, মহিম খুড়ো শূন্য করেছে তার জিলিপির বেকার, এখন আর মনে করতে পারছি না গল্পের মধ্যে এত মজে গিয়েছিলাম। এবার আর একটা গল্পের গন্ধ পেয়ে নড়ে-চড়ে বসলাম।

'সে ব্যাপারটা আবার কি?'

'এ মেলায় প্রতি বছরই দু'টো একটা খুন হয়, হবেই। আর খুন হয়, তারাই হবে, যারা গোরাই গাজীকে নিন্দে করে, অবজ্ঞা দেখায়।'

'না মশায়, শুধু তারাই কেন, ডাকাত বদমাশ জুয়াড়ী না?' পাশের লোকটি বলল।

'ঠিক', পেছন থেকে সায় দিল আর একজন। 'গত বছর ত জুয়ার ছকের ওপরেই উপুড় হয়ে পড়ল নন্দ কাঁহার। আর উঠল না। লোকটা বেইমানি করেছিল।'

'এ বছর কিন্তু এখনও শোনা যায়নি।'

'শুনবে, সবে ত মেলার দু'দিন। ন' দিনের এখনও পুরো সাতটা দিন বাকি।'

'হয়ত ইতিমধ্যে খুন জখম কেউ হয়েছে, আমরা জানি না।'

'কিন্তু মজা কি জানেন?' একজনের মুখের কথা কেড়ে নিল আর একজন, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, 'ধরা পড়ে না। গোরাই গাজী তাকে রক্ষা করেন, যেমন কালু ঘোষকে করেছিলেন।'

শুনতে শুনতে সিঁটিয়ে উঠেছি। এবারও খুন একটা হয়েছে, এ মেলার রীতির ব্যত্যয় ঘটেনি। হোক না মেলা থেকে তিন চার মাইল দূরে। উপলক্ষটা ত মেলাই। হঠাৎ মনে হল, অমন লোহার মতন শক্ত দীর্ঘকায় মানুষটাকে যে মারতে পেরেছি সে

নিশ্চয়ই গোরাই গাজীরই দয়ায়। আমি কখনো সন্তানহারা মায়ের শোকার্ত মুখ দেখিনি। কিন্তু এখন রাখালের মাকে যেন মনের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, যেন দেখতে পাচ্ছি সৌম্য পুরুষ দিব্যকান্তি গোরাই গাজীকেও। স্থান মাহাত্ম্যেই হয়ত, নয়ত কেন মনে হবে সমস্ত মানুষে, এই বিশ্ব-চরাচরের সবকিছুতে আসলে একটাই বোধ কাজ করে, জীবিত মৃত দৃশ্য অদৃশ্য প্রত্যেকে ওই একটি বোধের সম্পর্কে বাঁধা, আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'আচ্ছা, পীরের আস্তানাটা কোথায় ?'

'সেকি, এখনো সেখানে সিন্নি দাওনি পেলা দাওনি ? সকলে আমাকে তিরস্কার করে উঠল।

বেশ রাত হয়েছে, ঝিমিয়ে পড়েছে মেলা। কোন দোকানেই আর খদ্দের নেই। রাস্তায় গলিতেও মেলাদর্শকের যাতায়াত কমে গেছে। দোকানে দোকানে মালিক কর্মচারিরা হিসেব-নিকেশ করছে কিংবা গল্পগুজব। পেট্রোমাকস্ মশাল-ডিবে কারবাইড কুপির আলো কোথাও সন্ধ্যার মতনই উজ্জ্বল, প্রাণপণে জ্বলছে। কোথাও মলিন হয়ে এসেছে, টিমটিম করছে কোনমতে।

সারকাসের তাবুতে বেশ জমাট একটা কনসারট বাজছে, বোধ হয় একটা উৎকৃষ্ট খেলা দেখানো হচ্ছে এখন। দূরে ঢোলক আর কাঁশি বেজে উঠছে থেকে থেকে, তরজার লড়াই হয়ত জম-জমাট। আরও দু' একটা জায়গা থেকে অনুরূপ আনন্দের ছোট ছোট হৈচৈ শোনা যাচ্ছে। মেলার মানুষকে এরাই বুঝি আটকে রাখছে সারারাত অন্তত অর্ধেকটা রাত। মেলায় এলে তিন রাত্রি থাকতে হয়, আমোদ-প্রমোদ না থাকলে থাকবে কেমন করে। খাওয়ার হোটেল আছে, হোটেলে থাকার জায়গা আছে। তাই তীর্থে এসে শোয়া-থাকার ভাবনা নেই কারো। একটা নির্জন

গলি ধরে হাঁটছিলাম, এক জায়গায় দেখি কয়েকটি যুবতী জটলা করছে।

'কেউ আগ বাড়িয়ে ধরবি নে, ও যাকে ধরবে ও তার।'

আমি হেঁটে চলেছি দাঁড়াচ্ছি না দেখে একজন বলল, 'পকেটে পয়সা নেই।'

আর একজন বলল, 'ফুরতি করতে আসেনি, ফুরতি দেখতে এসেছে।'

আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ থেকে থেকে চাঁদকে আড়াল করে ফেলছিল। নিবন্ত বাতির মতন হয়ে যাচ্ছিল চাঁদ। ক্ষণকালের জন্যে চারধারে মলিন অন্ধকার নেমে আসছিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই মেঘমুক্ত চাঁদ হেসে ফেলছিল ফিক্ করে। ঝক্‌ঝক্ করে উঠছিল চারধার। তবু সে আলোয় মুখ চোখ দেখা যাচ্ছিল না ভাল করে। এ গলিতে অর্ধেক জায়গা জুড়ে গাছের ছায়া ঘরের ছায়া। কেবল মাঝে মাঝে সারকাসের তাঁবুর ওপরকার ঘুরন্ত আলোটা এসে পড়তে মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল ওদের মুখ। আমার মুখ। সেই পলকের আলোকে এক জোড়া চোখ দেখে চমকে উঠলাম। যেন সন্ধ্যার চোখ জোড়া দেখলাম, তেমনি আয়ত স্নিগ্ধ গভীর। আমি একটু হলে ওর হাত ধরে ফেলেছিলাম, দ্বিতীয় পলকের আলোতে ভুল ভাঙল। সন্ধ্যা না মালতী না, আমার চেনা কেউ না। অথচ যেন কত মিল। পার্থক্যটা যেন কেবল চটুলতায় দুষ্টুমিতে। এ চোখের মতন এত চটুল কারো চোখ দেখিনি। এ চোখের মতন এত সুখীও না। হয়ত মেলার জন্যে। এ মেয়ে মেলায় এসেছে বলে চোখে এত এত দুষ্টুমি।

আমি চলে যাচ্ছিলাম, সে এগিয়ে এল।

'কি গো, পছন্দ হল না?'

'খুব।'

'তবে চলে যাচ্ছ যে বড়?'

'আরে ট্যাঁক যে চৈত্রের মাঠ'

'ক'টা টাকা নিয়ে এসেছিল, জামা কাপড় কিনেই ফতুর!'

'অথচ সখ আছে!'

পেছনে কতকগুলি বিদ্রূপের গলা একসঙ্গে খিলখিল করে উঠল।

আমি আস্তে পায় হেঁটে চলেছিলাম। সে-ও আমার সঙ্গে পা বাড়াল। আমার হাত ধরল যুবতী। নরম নিঃশ্বাসের স্বরে বলল, 'পয়সা চাইনে, তুমি এস।'

আমি বললাম, 'ভেবেছিলাম চেনা-জানা।'

'সবাই গোড়াতেই চেনা-জানা থাকে নাকি? এস চেনা-জানা হতে বেশীক্ষণ লাগবে না।'

তবু থামছি না বলে সে আমার হাতে মৃদু চাপ দিল।

'মেয়েরা কখন সাধে তুমি জান?'

হাসলাম, 'কখন?'

সে আমার হাতে ভর দিল। কাঁধে মাথা রাখল। বলল, 'যখন ভাল লাগে, যখন ভালবাসে।'

আমি জানি, মেয়েরা আমাকে একপলকে ভালবেসে ফেলে। আমারও ভাললাগছিল, ওকে আমি বিমুখ করলাম না।

'চল, কোনটা তোমার ঘর?'

কোন ঘরে গান, কোন ঘরে হৈচৈ, হালকা হাসি কোন ঘরে, কোন ঘর স্তব্ধ অন্ধকার। গাছ-গাছালির ফাঁকে-ফাঁকে ছড়ানো-ছিটোনো ঘরগুলির একটাতে এনে আমাকে মাদুর পেতে দিল যুবতী।

'বস। রাত হয়েছে। আগে কিছু খাওয়া যাক, বল, কী খাবে?'

'তোমার যা ইচ্ছে।' আমি কোমর থেকে কোঁচার খুঁট টেনে বের করলাম।

'না না,' প্রবল আপত্তিতে মাথা ঝাঁকালো সে। 'আমি তোমাকে ডেকে এনেছি, তুমি আমার অতিথি, আমি তোমাকে

খাওয়াব।' সে ব্লাউজের ভিতর থেকে ছোট মানি ব্যাগটা হাতে তুলে নিল। 'মাংস পরোটা নিয়ে আসি, কেমন?' জিজ্ঞেস করল কিন্তু সম্মতির অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেল। বাইরে থেকে ঝাঁপটা টেনে দিয়ে গেল ঘরের।

দূরে কোন্ ঘরে প্রাণপণ তবলা বাজাচ্ছে একজন; দিন্-দিন্—দিন্ তেটেতে টেতেটে···নিকটের এক ঘরে কোন্ আনাড়ী মেয়ে গান ধরেছে—কে নিবি ফুল, কে নিবি ফুল···গানের বন্যায় হাল্‌কা আলাপ, হৈ চৈ, তবলার বোল ডুবে গেল। আমি অন্য-মনস্ক হবার জন্যে ছোট্ট ঘরখানা দেখতে থাকলাম।

এক পাশে পরিপাটি করে বিছানা পাতা। একটা বাঁশের খুঁটিতে পেরেকের সঙ্গে হারিকেন জ্বলছে। খুব যত্ন করে মোছা-ঘষা হারিকেনটির অনুজ্জ্বল শিখা থেকে নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে ঘরময়। একধারে ছোট্ট একটি টিনের বাক্স, তার ওপরে আরশি চিরুনি নানা ধরনের শিশি কৌটো সাবান—প্রসাধনের জিনিস। সেখানে বেড়ার গায়ে দড়িতে ঝুলছে কয়েকখানা শাড়ি, ব্লাউজ কয়েকটা, একখানা গামছা। এক কোণে একটা কুজোর ওপরে একটা গ্লাস উপুড় করা। দেখে আমার পিপাসা পেল। অতগুলি জিলিপি ফুলুরি খেয়েছি, জল খাইনি এক ফোঁটা। গল্পে মজে গিয়ে জল খেতেই ভুলে গেছি।

জল খেয়ে ফিরে এসে জায়গায় বসেছি। ঝাঁপ ঠেলে ঘরে ঢুকল মেয়ে। শালপাতার দুটো বড় বড় ঠোঙা হাতে। সে দুটো সন্তর্পণে রেখে বিছানার একটা ধার গুটিয়ে শিয়রের কাছে রাখা চীনামাটির প্লেট দুটো আনতে গিয়েছিল। যেন সাপ দেখে ভয় পেয়েছে এমন ভাব করে বসে পড়ল।

'এগুলি কী!'

ওর চোখে মালতীর চোখ যেন দেখলাম আবার করে। কঠিন

হয়ে উঠেছে দৃষ্টি, চোখের তারা নক্ষত্রের মতন জ্বলছে। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম।

'অমন করে চেয়ে আছ কি!'

যে নোটগুলি ওকে দিতে চেয়েছিলাম। ও না, না, বলে আপত্তি করে নিতে চায়নি আমি তাই রেখে দিয়েছিলাম বালিশের নিচে।

'যে ছুঁড়িরা ঠাট্টা করেছিল, তাদের গিয়ে টাকার দেমাক দেখাও!' বলে আমার কোলে সে নোটগুলি ছুঁড়ে দিল।

'ও টাকায় খুনের রক্ত লেগেছে, আমি আর ছোঁব না।' কাউকে কথাটা বলার জন্যে আমি যে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম কথাটা বলে আমি সেটা বুঝতে পারলাম। আমার মনটা চমৎকার হাল্কা হয়ে গেল।

'খুনের রক্ত!' নিমেষে কঠিন দৃষ্টি নরম হল। তার বদলে শুধু বিস্ময় নয় কিসের এক প্রত্যয়ও যেন ঝিকিয়ে উঠল।

আমি ও-কে ঘটনাটা বললাম। ও মুগ্ধ হয়ে শুনল। অভিভূত কণ্ঠে বলল, 'জান এ মেলায় ফি বছর দুটো একটা খুন হয়। ফি বছর দুটো একটা করে চোর্ বদমাস মরে তবু ব্যাটাদের হুঁস হয় না।'

'তুমি কখনো খুনী দেখেছ?'

'আমি ত মেলায় এই প্রথম এলাম, যারা প্রতি বছর আসে তারাও দেখেনি। এ গোরাচাঁদেরই দোয়া। খুনী ধরা পড়ে না। কালু ঘোষ...'

আমি বললাম, 'সে গল্প আমি একটু আগে শুনেছি।'

'তা হলেই দেখ, তোমার কোন ভয় নেই। তুমি নিশ্চিন্ত। এখন হাত ধোও খেতে বস। মাংস পরোটা ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে এতক্ষণে।'

খেতে খেতে ও শুধোল, 'আচ্ছা এত টাকা নিয়েই বা তুমি রাস্তায় বেরিয়েছিলে কেন?'

'টাকাটা দিয়ে দেব তোমার মতন এমন কাউকে যে পাইনি।'

'ঠাট্টা রাখ, কী কিনবে বলে তুমি মেলায় এসেছ ?'

'কিছু রং আর তুলি।'

তার জন্যে এত টাকা ?'

আর কোথাও রাখবার জায়গা ছিল না।'

'বাড়িতে রেখে আসতে পারনি ?'

বাড়ি! মুহূর্তের জন্যে চুপ করে রইলাম। তারপর একটি একটি করে আমার জীবনের কাহিনী ওকে বললাম।

শুনে বিস্ময়ে আর একবার ওর চোখ গোল হল। তারপর বিষণ্ণ মলিন হল নক্ষত্র-উজ্জ্বল চোখ, ছলছলিয়ে উঠল। কিন্তু যখন কথা বলল তিরস্কার ধ্বনিত হল তার কথায়।

'কী দুঃসাহস তোমার! পরনে একটা হাফপ্যান্ট, গায়ে একটা হাফশার্ট, তুমি শূন্য হাতে পথে বেরিয়ে পড়েছ! তুমি ত অসুস্থ হয়ে পড়তে পারতে, না খেয়ে মরে যেতে পারতে!'

'কিন্তু অসুখ হয়নি যে, না খেয়ে মরিনি যে, সে ত তুমি শুনলে।'

'শুনলাম। আমিও পনর বছর বয়সে ঘর ছাড়া। দশ বছর পথে পথে ঘুরছি। পথের যে কী কষ্ট কী জ্বালা সে কি আমি জানি নে!'

'পথে মেয়েদের কষ্ট যন্ত্রণা বেশী।'

'পুরুষেরও কম নয়, কখনো কখনো বরং আরও বেশী। আমার কথা শোনো, তুমি ঘরে ফিরে যাও। এটা তোমার ভালবাসা পাবার বয়স। যে দেখবে সেই তোমাকে ভালবাসবে। আদর করবে। পথ থেকে ডেকে এনে খাওয়াবে, শুতে দেবে, তোমার সঙ্গে শোবে। এমন রূপ এমন বয়সের এটা ভাগ্য। কিন্তু এ বয়স এ রূপ চিরদিন থাকবে না। পথ বড় নিষ্ঠুর। একদিন সে নিঃশেষে তোমার রূপ যৌবন কেড়ে নেবে। ক্ষুধায় শুকনো কাঠ হয়ে যাবে তুমি। গালে হাড় জাগবে, চোখ গর্তে বসে যাবে।. সর্বাঙ্গে পাঁচড়া চুলকণা হবে। উকুন পড়বে মাথায়।

সেদিন তোমাকে কেউ ডেকে নিয়ে খাওয়ানো দূরে থাক, তুমি কারো সামনে গেলে সে শিউরে উঠবে। পালাবে কিংবা থুতু দেবে।

'তা জেনেও ত তুমি পথেই থেকে গেছ।'

'আমার উপায় ছিল না। জানি আমারও ওই দশা হবে। যে মেয়ে একবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে বাড়ি ঢোকার পথ তার চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। আমি পথের পাশে পচে গলে মরে থাকব। আমার হাড় মাংস শেয়ালে শকুনে খাবে। সেই আমার ভাগ্য। কিন্তু তোমার সে দুর্ভাগ্য হতে যাবে কিসের জন্যে? তুমি বুদ্ধিমান তুমি সুন্দর, তুমি নূতন-যুবক—ইচ্ছা করলেই তুমি সুখী হতে পার।'

'ইচ্ছা করলেই মানুষ সুখী হতে পারে?'

'তুমি পারবে। গোরাচাঁদের কাছে মানত কর। তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।'

'তুমি মানত করেছিলে?'

'আমি যে পাপী।'

'আমিও ত খুনী।'

'না, গোরাচাঁদ শিষ্টের হাত দিয়ে দুষ্টের দমন করেন। গোরাচাঁদের চোখে তুমি খুনী নও।

'তুমি কী জন্যে মেলায় এসেছ বললে?'

'রং তুলি কিনতে।'

'তুমি পটুয়া হবে?'

'হ্যাঁ।'

'দেখো তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।'

'কিন্তু রং তুলি কিনলেই ত ছবি আঁকা যায় না। গুরু চাই। যে লোকটাকে আমি খুন করেছি সে কংসারি পাল নামে এক গুণীর নাম করেছিল, নাকি মেলায় তাকে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেকি সত্যি বলেছিল?'

'জানি না, এ মেলায় পটুয়াপট্টিতে তুমি খোঁজ নিও। কংসারি পাল হোক কি অন্য কেউ, একজন গুণীর সন্ধান তুমি পাবেই। তোমার গুরু মিলবে বলেই গোরাচাঁদ তোমাকে ডাকাতের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। তুমি বলেছ, ডাকাতটা তোমার চেয়ে বড় তোমার চেয়ে জোয়ান ছিল। গোরাচাঁদের দোয়া না থাকলে তুমি কখনো পারতে তার সঙ্গে ?'

ওর মনের এই গভীর প্রত্যয় আমাকে বিস্মিত করল। আমি বাঁ হাতে ওর থুতনি ধরে ওর চোখের মধ্যে তাকালাম, 'সত্যি বলছ ?' ও কোন কথা বলল না। আমি ওর ছলছলে চোখে আশ্চর্য এক বিশ্বাস প্রত্যক্ষ করলাম।

ও আমার হাত সরিয়ে দিয়ে গভীর সুখে হাসল। বলল, 'হাতের এঁটো শুকিয়ে চড়চড় করছে, এস মুখ হাত ধোবে।'

বললাম, 'একটু বেশী করে জল দাও পা'টাও ধোব।'

'ওমা, তাই ত ! আমার আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল। এস।'

সে একটা জলচৌকি এনে দরজার সামনে বসতে দিল। সাবান নিয়ে এল, জল নিয়ে এল।

আমি বললাম, 'আমাকে দাও।'

সে ধমকে উঠল, 'থামো ত !'

সে পরম যত্নে আমার পা ধুইয়ে দিল, গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিল।

আমি এসে আবার মাদুরের ওপরে বসলাম।

ও এবার হাসল, চতুর হাসি, যেন কোন দুষ্টুমি এসেছে মাথায়।

আমি শুধালাম, 'কী ?'

ও একটা গ্লাস আর একটা বোতল নিয়ে এল।

'একটু মদ খাও।'

'কখনো খাইনি।'

'অনেক মাংস পরোটা খেয়েছ, একটু মদ খেলে হজমটা ভাল হবে।'

সত্যি গল্পে গল্পে অনেক খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। শুধু মাংস পরোটা না। ও সন্দেশ রসগোল্লাও এনেছিল। কিছু ফেলিনি। যা পাতে দিয়েছে তাই খেয়ে নিয়েছি।

বললাম, 'বেশ, দাও।'

অল্প একটু মদ অনেকটা জলে মিশিয়ে দিল তবু দু' চার চুমুকের বেশী গলা দিয়ে নামল না। ওয়াক আসছিল। ও বলল, 'থাক খেয়ে কাজ নেই।' ও-ও বেশী খেল না। বোতল গেলাস তুলে রেখে কাছে এল। সেই দুষ্টু হাসি চোখে, 'কি গো, চেনা-জানা হল?'

হাসলাম, 'মোটেই না।'

'এত কথার পরেও না?' মিটি মিটি হাসছিল আর দুষ্টুমিতে ও অস্থিরতায় ছটফট করছিল।

'বারে, এখনো যে নামই জানা হল না।'

'ওমা তাই ত, এত কথা বলেছি অথচ'···বলতে বলতে ওর স্বর বিষণ্ণ ও মুখখানি মলিন হয়ে গেল। 'মনে থাকে না, অন্যকে বলব কি নিজেই নিজের নাম মনে করতে পারি না অনেক সময়, আমাদের নামে ত কারো কাজ নেই তাই কেউ শুধোয় না। কিন্তু তোমার কথা আলাদা, তুমি ত সাধারণ নও। সব আগে তোমাকে আমার নাম বলা উচিত ছিল।' সে আমার গলা জড়িয়ে ধরল।

'আমার নাম বসন্ত, বসন। তোমার নাম?'

'শান্তনু, শানু।'

'এবার চেনা-জানা হল ত শানু?'

প্রশ্ন করে চাপা হাসিতে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকল বসন্ত। আমি মুগ্ধ হয়ে ওর চোখে মুখে সেই চাপা হাসির অস্থির ছটফটানি দেখছিলাম।

'বুঝতে পেরেছি, আরো ভাল করে চিনতে চাও, জানতে চাও।'

সে শরীরের সব বসন একে একে খুলে ফেলল। হারিকেনের

শিখাটাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়ে বিবসনা বসন্ত সুঠাম শরীরে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখ ত এখন চেন কিনা?'

আমি আমার মনের গভীরে চমকে উঠলাম। কী বলতে চায় বসন্ত? কী বলল সে? নানা পরিচয়ে যত বিচিত্ররূপিণী দেখি মূলত সবারই এই একটাই রূপ, মৌলক রূপ, এই রূপে এলেই তবে তাকে যথার্থ চেনা যায়। বোধ হয় তাই, নয় ত আমার পরিচিত সবাইকে কেন এর মধ্যে অনুভব করছি, সেই বেদেনী থেকে সন্ধ্যা মালতী পর্যন্ত এমন কি আমার মা আন্নামাকেও।

'কী দেখছ হাঁ করে, কী ভাবছ এত?' বসন্ত আমার শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার জামা কাপড় খুলে নিল। আমরা ছুটি মানুষ একটি মৌলিক বোধের মধ্যে ডুব দিলাম।

মেলায় মানুষের বিচিত্র কলরবে খুব ভোরে আমার ঘুম ভেঙে গেল। সবে সূর্য উঠেছে তখন। দাপনার বেড়ার সহস্র ফাঁক-ফোকর দিয়ে ছোট ঘরখানি তার কাঁচা হলুদ আলোয় ভরে উঠেছে। বসন্ত তখনও নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। তার মুখে আশ্চর্য এক শান্তি। সন্তান হবার পরে কামার-বউর মুখে মশালের আলোয় যে শান্তি আমি দেখেছিলাম, মৃত্যুর পরে ডাকাতটার মুখে রাত্রি-শেষের চাঁদের আলোয় যে শান্তি আমি দেখেছিলাম—মৌলিক শান্তির চেহারা সব মুখেই যেন এক। সব সময়েই এক রকম। আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম বসন্তর ঘর থেকে।

৬

একটি ছোট একচালা ঘরের পেছনে বসে একটি মানুষ বাটিতে বাটিতে নানা রকম রং নিয়ে সরার ওপরে পট আঁকছিল। আমি এসে নিঃশব্দে পেছনে দাঁড়িয়েছি। মানুষটি এক একটি রংয়ে তুলি ডুবিয়ে নিচ্ছে আর সরার ওপরে টেনে টেনে যাচ্ছে, অল্পে আস্তে সমস্ত সরা জুড়ে নানা রংয়ের এক একটি চমৎকার দৃশ্য ফুটে উঠছে। দেখে দেখে আমার হাত নিশপিশ করছিল, মনে হচ্ছিল যেন আমিই আঁকছি, আমার হাতই ওই মানুষটির হাত হয়ে এঁকে যাচ্ছে সব। শেষে অস্থির হয়ে তার সামনে বসে পড়েছি।

'আমাকে আঁকতে শেখাবে?'

তুলিটা রংয়ের মধ্যে ডুবাতে গিয়ে সে ভুরু কুঁচকে তাকাল। তারপর আবার আঁকতে মন দেবে হঠাৎ মুখ তুলে বলল, 'আঁকতে কাউকে শেখানো যায় না। ওটা যে পারে সে আপনি পারে। কাক গাইতে পারে? কোকিলকে কে গান শিখিয়েছে?'

মানুষটির কথায় আমার মনের একটা বন্ধ দরজা যেন খুলে গেল। আমি ওর ডালা থেকে একটা বাঁশের কঞ্চি তুলে নিয়ে মাটিতে একটি মুখ আঁকলাম। সম্পূর্ণ মুখ নয়, একজোড়া চোখ একটি নাক দুটি ঠোঁট। বললাম, 'আমি নিজে এটুকু শিখেছি।'

সে তার তুলি রেখে অপলক দু' মুহূর্ত দেখল। ততক্ষণে আমি আরো দুটি মুখ অবয়বের সামান্য আদলও এঁকে ফেলেছি।

সে আমার পিঠে হাত রাখল। আমার চোখে চোখ রেখে ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলল, 'এমন কথা-বলা চোখ যে আঁকতে পারে সে-ত জন্ম-শিল্পী। চর্চা কর, তোমার হবে।'

'উহুঁ' আমি বললাম, 'তুমি গুরু হও তবেই হবে।'

'না।'

সে আমার গুরু হতে রাজী হল না। কিন্তু প্রশ্রয় দিল। হাতে তুলি তুলে দিল, এগিয়ে দিল পোড়া মাটির সরা।

এ মেলায় সরার খুব চাহিদা। মেলায় যারা আসবে বাড়ি ফেরার মুখে তারা একখানা সরা নিয়ে যাবে। সরার বিষয় গোরাচাঁদের কিংবদন্তী নিয়ে নানা দৃশ্য। যেমন রাখালের মার কুঁড়ে, দাওয়ায় শোকার্ত মা। গোরাচাঁদের পদতলে লুণ্ঠিত মা। অথবা গোরাচাঁদ রাখালের জীবনদান করছে। কালু ঘোষের গাই গোরাচাঁদের মুখে দুধ ঢালছে ইত্যাদি।

কিন্তু অত সব কেমন করে আঁকব! আমি আনাড়ীর হাতে পেছনে গাছ ও কুঁড়ের আভাস দিয়ে বেদনা বিহ্বল চোখ আঁকি। যে-চোখ আমি দেখেছিলাম যখন সুভদ্রা বাপের ছাড়া-ভিটেয় এসেছে। দু' তিনখানায় সে চেষ্টা করে আমি আমার তুলিতে যা আসছিল তাই আঁকছিলাম। ডিমের কুসুমের মতন সূর্য এঁকেছি একটিতে—নিঃসীম কালো আকাশ, একটি পরী উড়ে যাচ্ছে সূর্যের দিকে। একখানিতে এঁকেছি তারার বদলে আকাশে বিষণ্ণ কতকগুলি চোখ, নিচে নদী কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে।

আমি তন্ময় হয়ে আঁকছিলাম। এক একখানা সরা আঁকতে অনেকক্ষণ সময় নিচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে সংকোচ বোধ হচ্ছিল। মিছিমিছি কতকগুলি সরা রং নষ্ট করছি না ত! একবার কথাটা বলতে সে হাসল। আমার আঁকা একখানা সরা গামলার জলে ডুবিয়ে তুলে একটা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলে বলল, 'দেখ, নষ্ট হয়নি। সরা নষ্ট হয় না, শুকোলেই ঠিক হয়ে যাবে। আর চার পয়সার রংয়ে দশখানা সরা আঁকা যায়, তুমি এখনও দু' পয়সার রং খরচ করতে পারনি।'

শুনে আশ্বস্ত হয়েছি, আমার উৎসাহ আরও বেড়ে গেছে।

মাঝখানে সে আমাকে চা খাওয়াল, মুড়ি খাওয়াল। এতখানি অন্তরঙ্গতায় আমি যেন দিশেহারা হয়ে গেলাম। জানিও না পুবের সূর্য কখন পশ্চিমে কাত হয়েছে। দেখলাম যখন বসন আমাকে টেনে বাইরে নিয়ে এল।

'দেখ ত বেলা কোথায় গেছে? এখানে দিব্যি নিশ্চিন্তে বসে আছ, বলি তোমার কি ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই? তুমি কী অ্যা! সব টাকা আমাকে দিয়ে এলে, এখন খাবে কী? না খেয়ে থাকতে কষ্ট হয় না? না খেয়ে মরবার ভয় নেই? আশ্চর্য মানুষ!' বসন খুব কষে ধমকাল আমাকে।

উদ্‌ভ্রান্তের মতন সমস্ত মেলাটা সে খুঁজেছে। দু'তিন বার ঘুরে গেছে পটুয়াপট্টিটাও। শেষে যখন দোকানে দোকানে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে তখন পেয়েছে আমাকে। ধরে নিয়ে এল ঘরে।

স্নান করে এলাম। সে আমাকে আসন পেতে দিল। আমি জানি হোটেলের রান্না ভাত ডাল তরকারি মাছ কিংবা মাংস খাব। যেমন কাল খেয়েছি। দেখি, মাটির নূতন হাঁড়ি থেকে চকচকে কলাই-করা বাসনে ভাত বাড়ছে বসন। কলাই-করা আরও কিছু বাসন বাটি আশেপাশে ছড়ানো তাতে থরে থরে রান্না। দেখে আমার কপাল কুঁচকে গেল।

'কাল এসব দেখিনি ত, কোথায় রেখেছিলে?'

'কোথায় আবার রাখব, কাল এসব ছিল নাকি? আমি ত হোটেলে খেতাম। আমরা সবাই হোটেলে খাই, কে আবার রান্নার ঝামেলা পোহায়। তোমাকে খাওয়াব বলে আজ সকালে সব কিনেছি।'

'আমার জন্যে কেন তবে মিথ্যে ঝামেলা করতে গেলে। আমিও ত হোটেলে গিয়ে খেতে পারতাম।'

'পারতে, তাতে তোমার ক্ষুধা মিটত কিন্তু আমার ক্ষুধা

মিটত না। জীবনে কোনদিন কাউকে ভালবেসে কিছু করতে পারিনি। বড় ইচ্ছে, আমার মনের সে ক্ষুধা তোমাকে সেবা করে মিটাব।'

সেই সেবা সেই মাতৃত্বের ক্ষুধা—আমার মধ্যে সন্তানের ছায়া দেখেছে বসন্ত।

আমি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খেলাম তারপর এক সময়ে মুখ তুলে বললাম, 'আমরা হলাম স্রোতের খড়, বসন্ত।'

সে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার খাওয়া দেখছিল। মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে গেল, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'সেকি আর জানিনে। দু'গাছি খড়কে স্রোতই এক সময়ে এক করে দেয়, আবার এক সময়ে সেই স্রোতই বিচ্ছিন্ন করে দু'টিকে দু'দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কোনদিন আর দেখা হয় না তাদের।'

'তবে এই মায়া কেন?'

'কাল তোমার ফেলে-আসা দিনগুলির কথা বলতে বলতে আমার অতীতের দিনগুলিকেও তুমি মনে করিয়ে দিলে, দেখলাম, আমার জীবনে এতটুকু সুখ-স্মৃতি কোথাও নেই। শুধু দুঃখের ইতিহাস। তাই ভাবলাম, তোমাকে সেবা করে অন্তত কিছু তৃপ্তি আঁচলে বাঁধি।'

'কিন্তু একজনকে পাবে বলেই না তার হাত ধরে পথে নেমে এসেছিলে?'

'সেই একজন যে অনেক জনের ভিতরে হারিয়ে গেল!'

বসন্তের যে দুঃখ আমারও তাই। একজনকে খুঁজি পাই অনেককে। সেই অনেকের মধ্যে একজনকে আমি অনুভব করি, কিন্তু তাকে পাব কেমন করে জানি না। যেন সে কোথাও নেই জেনেই আমি তাকে সৃষ্টি করতে চাই। সে প্রচ্ছন্ন ইচ্ছার যন্ত্রণা আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল।

যে আমাকে সারা সকাল পোড়া মাটির সরার ওপরে যা খুসি আঁকতে প্রশ্রয় দিয়েছিল বিকেলবেলা গিয়ে দেখি তার দোকান গুটোনো সারা।

কি ব্যাপার? না গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছি।

'আমিও যাব পরাণদা।'

'তুমি যাবে কোথায়? দেশে যে মড়ক লেগেছে।'

দেশে তার স্ত্রী-পুত্র সংসার সর্বস্ব, তাকে যেতেই হবে, আমাকে মড়কের মধ্যে সে কিছুতে নেবে না।

সে আমাকে রং তুলিতে হাতেখড়ি দিয়েছে, সেই আমার গুরু, তার বিপদে আমি যাব না এ কখনো হতেই পারে না। আমি নৌকোয় উঠে বসলাম।

'নাছোড়বান্দা ছেলে!' বলে সে হতাশ হয়ে চুপ করে রইল।

আরও ক'খানা নৌকো ভেসে পড়ল। ত্রাস লেগে গেছে নয়নডাঙার মানুষের মনে। প্রাণপণে নৌকো বাইছে মানুষ, কথা নেই কারো মুখে।

রাত পোহালে মড়কের বিভীষিকা নৌকো থেকে চোখে পড়ল। নদীর পাড়ে এখানে ওখানে চিতা জ্বলছে। কোথাও বাঁশের সঙ্গে বাঁধা মড়া পড়ে রয়েছে, পোড়ান হয়নি। দু'একটি মড়া নদীতেও ভাসছে দেখা গেল।

দেখে অব্দি পরাণ পাল হাউ হাউ করে কাঁদতে স্থরু করেছে।

আমি ধমকে উঠলাম, 'একি অলক্ষুনে কান্না কাঁদছ সেই থেকে, এতে অমঙ্গল ডেকে আনা হয় না? বিপদে ধৈর্য ধরতে হয়।'

অমঙ্গলের কথায় পরাণ পালের চিৎকার থামল কিন্তু চোখের জল বারণ মানছে না।

ঘাটে নৌকো ভিড়তে পরাণদা লাফিয়ে পড়ে ছুটতে আরম্ভ করল। আমিও পিছনে ছুটলাম। অনেক লোকের কান্না

হরিধ্বনি ও নাম-সংকীর্তন পিছনে ফেলে এসে পৌঁছলাম পরাণদার বাড়ি। গরীব গৃহস্থ। প্রতিমা গড়ার একটি দোচালার পিছনে দু'খানা থাকবার ঘর মাঝখানে প্রশস্ত উঠোন।

চতুর্দিকে হাঁড়ি সরা প্রতিমা তৈরির কাঠামো ছড়ানো। এক ধারে একটা একচালায় খড়।

উঠোনে একটি বউ একটি বৃদ্ধা তিনটি বাচ্চা জড়ো হয়ে আছে। একটি পনর-ষোল বছরের ছেলে গাঁটরি বাঁধতে ব্যস্ত। পরাণদাকে দেখেই বাচ্চা তিনটি ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। পরাণদার দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধার শুকনো মুখ হাসিতে ভরে গেছে, বউটিরও দেখলাম মুখে এখন খুশি হাসছে।

বৃদ্ধা ছেলের গায়ে হাত রেখে বলল, 'তুই এয়েছিস বাবা, বুকে যেন জল এল। দিনরাত ভয়ে মরছি, কখন কী হয়। ওলাদেবী এখনও আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন বাবা।'

তারপরে কখনো একে একে কখনো সমস্বরে ত্রাসের কথা বলতে থাকল সকলে। নিতাই ঘোষের বউ মরেছে তিনদিন আগে, ছেলেটা মরল কাল। অনাথের মেয়েটা শেষ রাতে তিনবার পাইখানা করেই চোখ বুজল। হরেনের বাবা···'

শুনতে শুনতে পরাণদার অসহ্য লাগছিল, সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'সব বেঁধে-ছেদে তোমরা কোথায় রওনা হয়েছ?'

'যেখানেই যাই এখানে আর থাকব না।' পরাণদার বউ বলে উঠল, 'তোমাকে ত সে খবর জানিয়ে মেলায় লোক পাঠিয়েছিলাম।'

'তোমরা চলে যাবে সে-কথা সে বলেনি।'

'না বলুক তুমি ত এসে পড়েছ, এখন চল।'

'আমার সঙ্গে যে একটি বিদেশী মানুষ!' অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকাল পরাণদা।

'তাতে কী হয়েছে।' পরাণদার মা আমার কাঁধে হাত রাখল,

'আমরা পরাণের শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল, এ মৃত্যু-পুরীতে তুমি কোথায় থাকবে বাবা ?'

আমি বললাম, 'ঘর-দোর ফেলে যাচ্ছেন চোর-জোচ্চোরে লুটেপুটে নেবে না ?'

'গরীব কুমোরের ঘরে কি আছে যে লুটেপুটে নেবে ? আর নেয় যদি নিক, আগে ত প্রাণে বাঁচি।' পরাণদার বউ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'তুমি বাগড়া দিও না বাবা, ওই শোন।'

দূরে কোথায় একটা 'হরিবোল' ধ্বনি উঠেছে। সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। এবং নিজে দু'হাত এক করে কপালে ঠেকিয়ে প্রায় কেঁদে উঠল, 'মা ওলা দেবী, রক্ষা কর মা।'

বৃদ্ধাও কপালে হাত ঠেকাল। বললে, 'বাবা, আজ তিনরাত ধরে এক ফোঁটা ঘুম নেই চোখে, চারদিকে কেবল হরিধ্বনি আর কান্না। সহ্য হয় না, সহ্য করতে পারিনে। সব লুটে নিক চোর-ডাকাত, পরাণটা ত বাঁচুক, চল।'

আমি তবু বলি, 'জল ফুটিয়ে খেলে, রান্না করে তখনই গরম-গরম খেয়ে নিলে কলেরা ত হবার কথা নয়, মা।'

'জল কোথায় পাবে ? যোগীপাড়া কামারপাড়া মালো-পাড়া কোথাও কোন পুকুরে জল নেই। শুকনো পুকুরগুলির তলায় যা পড়ে আছে তা দুর্গন্ধ কাদা।'

'আর সে-ও কি ভাল আছে বাছা।' বউ বলল, 'রোগের নোংরা কাপড় ধুয়ে নষ্ট করেছে, কলেরা ত তাইতেই এমন করে ছড়াল। কায়েতপাড়া বামুনপাড়া থেকে মানুষ এসে পই-পই করে বারণ করেছে, কে শোনে কার কথা। ফলে ভয় পেয়ে তারাও পালাতে সুরু করেছে। তাদের দেখাদেখি গাঁয়ের সবাই যেখানে যার একটু আত্মীয় সম্পর্কের লোক আছে, চলে যাচ্ছে।'

'তা হলে আপনারাও যান, আমি যাব না।'

'সে কি তুমি কোথায় থাকবে ?'

'কোথায় থাকব চিন্তা করে ত পথে বেরোই নি। কায়েত-পাড়ায় বামুনপাড়ায় যদি ঠাঁই হয় ত থাকব নয় ত জানি না অদৃষ্টে কী আছে।'

'তুমি বড্ড গোঁয়ার ছেলে।' পরাণদা ধমকে উঠল। শেষে মাকে বলল, 'দাও মা, ওকে ঘরের চাবি দাও।' আমাকে বলল, 'তুমি থাক আমার বাড়িতে, ওদের পৌঁছে দিয়ে আমি চলে আসব।'

'সে হয় না। ওকে আমরা আসতে দেব না।' পরাণদার বউ বলল, 'তুমি ওর পথ চেয়ে মিথ্যে আশায় থেকো না।'

'তবু চাবিটা থাক ওর কাছে। ও যে আমার অতিথি।'

'বেশ ত রান্না ঘরে চাল ডাল নুন তেল রেখে যাই, থাকতে পার রেঁধে খাবে, থাকবে। নয়ত চলে যাবে। যেমন ইচ্ছে।'

সেই ব্যবস্থা করে তারা চলে গেছে। মৃত্যু-পুরী থেকে জীবন্ত চলে যেতে পারছে, কাউকে ফেলে যেতে হচ্ছে না ভেবে তাদের মুখে কী আনন্দ কী তৃপ্তি। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। যে পথে আমরা ছুটতে ছুটতে এসেছিলাম, সে পথে তারা হাসতে হাসতে চলে গেল। মুহূর্তে ঝমঝমে উঠোনটা বাড়িটা, স্তব্ধ নির্জন হয়ে গেল, কেমন একটা গা-কাঁটা-দেওয়া ছমছমে হাওয়ায় ভরে উঠল বাড়িটা। সেই ছমছম নৈঃশব্দের মধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে আমি শুনতে লাগলাম—কাক ডাকছে, কুকুর ডাকছে। দূরে দূরে হরিধ্বনি উঠছে। খোলকর্তাল বাজছে। খুব কাছে একপাল শেয়াল ডেকে উঠল। দিনে শেয়াল ডাকে কখনো শুনিনি, আমি যখন রূপ্‌সির পাড়ে আমাদের গভীর অরণ্যে ঘুরেছি তখনও না। অনুভব করছিলাম, আমার শরীর কেমন ভার আর অসাড় হয়ে আসছে, আমি নড়তে পারছি না। তখন কি একটা জন্তু হঠাৎ ঘরের কোণের জঙ্গল থেকে লাফ দিয়ে উঠোনে পড়ে নিমেষে উঠোন পার হয়ে চলে গেল। আমি চমকে উঠলাম। বুঝলাম, আমি ভীষণ ভয় পেয়েছি। কিন্তু তখন আর আমার শরীরে

অসাড়তা নেই, যে-ছমছমে বোঝার মতন ভারটা আমাকে চেপে ছিল তাও উপে গেছে। হাল্‌কা বোধ করছি আমি। কিন্তু বড় পিপাসা, জিভ তালু বুক যেন শুকনো কাঠ। ভয় গেল পিপাসা বাড়ল, বাড়ছেই, যেন এক্ষুনি জল না খেলে আর বাঁচব না।

অথচ জল যে কোথাও নেই, রান্নাঘরেও না, সে ত ওরাই বলে গেছে। আমি বন-জঙ্গলের দিকে তাকালাম। কয়েকটা নারকেল গাছ চোখে পড়ল। কিন্তু ডাব কি ঝুনো, নারকেল বলতে কিছু চোখে পড়ল না। না পড়ারই কথা তবু বেরিয়ে এলাম শূন্য বাড়ি থেকে, শূন্য রাস্তা ধরে কিছু দূর এগুলাম তখন চোখে পড়ল খুব উঁচু একটা নারকেল গাছে কিছু নারকেল আছে। কেউ অত উঁচুতে উঠতে সাহস করেনি বলে আছে। আমি খুঁজে পেতে কিছু দড়ি সংগ্রহ করে উঠে গেলাম গাছে। ডাব মাটিতে পড়লে ফেটে যাবে তাই দড়ি বেঁধে অনেক কষ্টে পেড়ে নিয়ে এলাম। এই কষ্ট এবং পরিশ্রমের মধ্যে মনে জমে-থাকা ভয়ের শেষ তলানিটুকুও আর রইল না। আমি তখন সহজ মানুষ। এসে রান্না ঘরে ঢুকলাম। একটা ঘড়া চাই। জল আনব। রান্না করে খেতে হলে জল চাই। বামুনপাড়া কায়েতপাড়া যেখানে হোক জল নিশ্চয় মিলবে। কিন্তু রান্না ঘরে এসে আমার খুশির অবধি রইল না। বুদ্ধি করে পরাণদার বউ কিছু চিড়ে মুড়ি গুড় রেখে গেছে। যে ডাব আমি পেড়েছিলাম তার মধ্যে কয়েকটা ঝুনো ছিল। তারই জল আর শাঁস দিয়ে পেট পুরে চিড়ে মুড়ি খেলাম। আঃ সে যে কী আনন্দ।

সে আনন্দের আয়ু যে কত অল্প টের পেলাম গাছের মাথায় চোখ পড়তে। চমকে উঠলাম। সূর্য পশ্চিমের জঙ্গলের মাথায় হেলে পড়েছে। চৈত্রের এত বড় দিন কখন যে গড়িয়ে গড়িয়ে বিকেলে এসে ঠেকেছে জানতে পারিনি, যেমন করে হোক এই

বেলাটুকুর মধ্যে এক ঘড়া জল সংগ্রহ করে এনে রাখা চাই।

পরাণদার বউ বলেছিল তখন, 'জল আছে নদীতে যাতায়াতে চার মাইল, জল আছে বামুন পাড়ায় যাতায়াতে দু'মাইল, এই মৃত্যু-পুরীর মধ্যে দিয়ে কে গিয়ে বারে বারে জল আনবে সেখান থেকে!' জল নেই বলে তারা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল, যারই সুযোগ সুবিধা আছে, চলে গেছে, যাবে, যাদের কেউ নেই কোথাও তারা ডোবা-খালের জল খেয়ে কিংবা জল না খেয়ে মরবে, মরছে। জল যে আমাদের জীবনে কী ভীষণ প্রয়োজন আজ এখানে না এলে জানতাম না। আমি একটা ছোট ঘড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কায়েতপাড়া বামুনপাড়া যেখান থেকে হোক জল আনব কিন্তু সে যে কোথায় কোন দিকে জানি না। কেবল জানি নদীর দিকে নয়, আমি যে পথ ধরে নদী থেকে পরাণদার বাড়ি এসেছি সে পথ ধরে গ্রামের ভিতর এগিয়ে চললাম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কত গ্রাম হেঁটে পার হয়েছি এমন প্রেতপুরীর মতন গ্রাম দেখিনি। বাড়িগুলি অধিকাংশ নির্জন যেন ছাড়া ভিটে। কম বাড়িতেই হাসি খুশী মানুষ চোখে পড়ল, নিতান্ত পাগল ছাড়া অবশ্য এ দুর্দিনে কেউ হাসে না। কিন্তু মুখে সাহস ধৈর্য আত্মবিশ্বাস দেখলাম না কারো। 'কোথায় কায়েতপাড়া বামুনপাড়া—জল কোথায় পাব?' জিজ্ঞেস করলে মানুষগুলি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছে, দু'একজন হো হো করে হেসেছে।

হদিস দিল এক শ্মশান-যাত্রী।

'সোজা চলে যাও বাছা, জল পাবে কিনা জানি না তবে টলটলে জলের পুকুর দেখতে পাবে।'

পেয়েছিলাম। এবং বামুনপাড়ার ভলানটিয়ারদের আদেশ নির্দেশ অনুসারে লাইন দিয়ে জল যখন পেলাম তখনও গাছের

মাথায় ও পশ্চিম আকাশে যথেষ্ট রোদ আছে দেখে মনে ভরসা ছিল চিনে চিনে পরাণদার বাড়ি আবার ঠিক পৌঁছে যেতে পারব। আমি ত জানতাম না আমার জন্যে পথে কী ভয় আর বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কখনো এক পথে দু'বার হাঁটিনি তাই পেছনে ফেরার রাস্তা মনে রাখবার অভ্যাস ছিল না আমার, আমি পরাণদার বাড়িটা হারিয়ে ফেললাম। সরু সরু পায়ে চলা পথ কখনো কারো বাড়ির উঠোন দিয়ে কখনো কারো বাড়ির পেছন দিয়ে কখনো বাঁশঝাড় বনবাদাড়ের ভিতর দিয়ে কোথায় কোথায় চলে গেছে, অথচ নদীর দিকে যাবার প্রশস্ত সোজা রাস্তায় এসে একবারও পড়ছে না। কাউকে যে ডেকে জিজ্ঞেস করব এমন মানুষ দেখছি না। কোন বাড়ি জনশূন্য কোন বাড়িতে শোকের কান্না, কোথাও ভীত সন্ত্রস্ত কলরব।

আমি যেদিকে পথ যায় চলতে চলতে একটি কুঁড়ের পাশ দিয়ে উঠোনে এসে পড়েছি হঠাৎ একটা ক্রুদ্ধ চিৎকার এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপরে। পেছনে 'বাবা বাবা' বলে একটা আকুল কান্না ছুটে এল। চেয়ে দেখে তক্ষুনি মনে হল, এক বিকারগ্রস্ত কলেরা রোগী, শরীরে বিকট দুর্গন্ধ। সে আমার কাঁধে ঘড়া দেখেই হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে হাঁ করল। আমার কাঁধের ঘড়া সে আকস্মিক টানে কাৎ হয়ে গেল। তার জলে ভিজে গেল মানুষটি। মানুষটি তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। ক্ষীণ মুমূর্ষু গলায় বলছে, 'জল, একটু জল দাও।' আমি বসে পড়লাম তার শিয়রে হাতের কোষে করে জল দিলাম মুখে কিন্তু তা গলা দিয়ে নামল না, তার দু'গাল বেয়ে পড়ে গেল। মেয়েটি মৃত বাপের বুকের ওপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

'বাবা, বাবা, তুমি আমাকে কার কাছে রেখে গেলে গো!'

ওই একটি চিৎকারে, ওই একটি আকুল জিজ্ঞাসায় জীবনের

সমস্ত নিঃস্বতাকে উজার করে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল মেয়ে। সেই স্তব্ধ শোকের দৃশ্য সামনে করে আমার শরীর অসাড় হয়ে আসছিল। প্রাণপণে নিজেকে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে তুললাম। এগিয়ে এসে হাত রাখলাম মেয়ের পিঠে। টেনে তুলতে হল না। সে নিজেই উঠে দাঁড়াল। চোখ মুছল। একটু সময় দেখল আমাকে।

বলল, 'আপনি নিশ্চয় এ গাঁয়ের মানুষ নন, আপনি আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না। চলে যান। খুব সাবধানে যাবেন। শেয়াল-কুকুরের ভীষণ উপদ্রব। হাতে একটা গাছের ডাল-টাল ভেঙে নেবেন। কিছু বলা যায় না, কামড়ে দিতে পারে।

'তুমি এই শব আগলে থাকবে কি করে, তোমাকে শেয়াল-কুকুরে কামড়াবে না?'

'সংসারে যার কেউ নেই সে-ত শেয়াল কুকুরেরই খাদ্য। আপনি যান, অন্ধকার হয়ে আসছে।'

'তুমি অন্ধকারে এই শব নিয়ে বসে থাকবে, আর আমি চলে যাব?'

'সবাই ত চলে গেছে। বাবার ওলা হয়েছে শুনে এখানকার তিন ঘর তাঁতি বাড়ি ছেড়ে পালাল। দুপুর বেলা কাকা-কাকি যখন তাদের ছেলেপুলেদের নিয়ে চলে গেল, একবার জিজ্ঞেস করল না, নিশি, তোর বাপ কেমন আছে!'

'যার কেউ নেই তার ঈশ্বর আছেন, নিশি।' আমি ওকে সান্ত্বনা দিতে ওর হাত ধরলাম।

এই সামান্য স্নেহে, সামান্য সান্ত্বনায় ও কেঁপে উঠল, কেঁদে ফেলল, আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলল, 'তুমি কি সেই ঈশ্বর, তবে আমাকে বাঁচাও।'

বাঁচাতেই হবে। মনের মধ্যে অনুভব করলাম, এই অসহায় মেয়েকে ফেলে চলে যেতে পারব না আমি। ওর মাথায় আস্তে

আস্তে হাত বুলোতে থাকলাম। আমার সান্ত্বনায় ও আশ্বাসে ক্রমশ সবল শক্ত হয়ে উঠতে পারল মেয়ে। তখন দু'জনে মিলে মশাল জ্বালালাম বাঁশ জোগাড় করলাম, সে বাঁশে শব বেঁধে দু'জনে অনেক কষ্টে অনেক বিলম্বে এসে পৌঁছলাম নদীর ঘাটে। দাহ করবার কোন উপায় ছিল না। শব নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে দু'জনে এসে উঠলাম পরাণদার বাড়ি।

অবশিষ্ট রাত আমার বুকের মধ্যে পড়ে রইল নিশিলতা।

ওর এই সুন্দর নামটি রেখেছিল ওর দাদু। দাদু ওকে বড় ভালবাসত। দাদু বেঁচে থাকতে ওদের অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল। পাঠশালায় পড়ত নিশি। তেরোয় পা দিলে দাদুই তাকে পাঠশালা ছাড়িয়ে আনলে, বিয়ে দেবে। প্রায় সব ঠিক এমন সময় দাদু মরে গেল। ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেল সম্পত্তি। দরিদ্র-অবস্থা সেই থেকে সুরু। তার মধ্যেও মা চেষ্টা-চরিত্র করে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল।

'আমি এমন অপয়া সেই মাকেও খেলাম। সংসারে রইলাম আমি আর বাবা। আমার বিয়ে হলে বাবাকে দেখবে কে তাই বাবার আগ্রহকে আমি কখনো উৎসাহ দেইনি। বাবার বয়সী এক গেঁজেলের ঘর করার চেয়ে বাবার সেবা করা বেশী সুখের মনে করেছিলাম আমি। আঠারো পেরিয়েও তাই আজও আমি কুমারী। না, বোধ হয় সে জন্যে নয়, তোমার জন্যে। ঈশ্বর তোমাকে পাঠাবেন বলে আমাকে কুমারী রেখেছিলেন। নয়ত রূপনগরের ছেলে এই মড়কের মধ্যে নয়নডাঙায় আসবে কেন? জল আনতে গিয়ে পথ ভুল করে আমার উঠোনে উঠবে কেন?'

নিশি যেমন ওর কথা বলেছে তেমনি আমার কথা শুনেছে। সব নয়। সব বলিনি, এ শোকের সময়ে সব বলা যায় না। তবে নয়নডাঙায় কেন যে এলাম তাকে বলেছি। আমি মূর্তি গড়ব পট আঁকব এ যে আমার জীবনের ধ্যান স্বপ্ন ও জেনে গেছে।

শুনতে শুনতে ওর চোখে জল এসেছিল, টের পেলাম আমার বুকে কয়েক ফোঁটা পড়তে। যদিও জানি, ও বুঝতে পেরেছে আমি ওর জন্যে নয়, আমার জীবন শুধু ওকে নিয়ে পূর্ণ ও সুখী হতে পারবে না, আমার জীবন মহৎ ও বৃহৎকে আয়ত্ত করতে বদ্ধপরিকর, তখনই ওর চোখে জল এসেছে, তবু যখন শুধালাম, 'কাঁদছ কেন?' ও তা স্বীকার করতে চাইল না। চতুর মেয়ে, বলল, 'জান, আমারও বড় সাধ ছিল বৃত্তি-পরীক্ষা দেব। 'বিয়ে দিয়ে দেব', বলে দাদু আমাকে পাঠশালা ছাড়িয়ে আনল। পুরুষ হলে কখখনো তা পারত না। তোমার মতন আমি বাড়ি ছেড়ে চলে আসতাম।'

'আর এক জন্মে তুমি পুরুষ হয়ে জন্মিও।'

'এতদিন তাই প্রার্থনা করেছি, আজ মনে হয়, না, আমি জন্ম জন্ম যেন মেয়ে হয়ে জন্মাই, আর যেন প্রতিজন্মে তোমাকে স্বামী পাই।'

সে আমার বুকে নিবিড় হয়ে থেকে এক সময়ে বলে উঠল, 'গোকুল পাল বলে একজনকে আমি জানি। মস্ত গুণী কারিগর। সুলতানগঞ্জে বাড়ি, নৌকোয় এখান থেকে দু'দিনের পথ, তুমি তার কাছে যেও।'

তারপরে নিশি আর কোন কথা বলেনি। যেন পরম আশ্রয় পেয়েছে, পরম শান্তি পেয়েছে—সেই আশ্রয় ও শান্তিকে সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করতে সে আমার শরীরের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। একসময়ে শেষে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। যেন কত রাত ঘুমোয় নি, না, যেন সারাজীবন সে শুধু জেগেছিল।

পরদিন ভোর না হতেই নিশি টেনে তুলল আমাকে। 'ওঠ, চল নদীতে চান করতে যাব।'

'কাল রাতেই ত চান করে এলাম, আবার এখনই কেন?'

'কথা বলো না, যা বলছি শোন।' দৃষ্টি তির্যক করে হেসে শাসন করল নিশি।

অতএব আবার দু'জনে এসে নদীতে নামলাম। আমার অনেক আগে উঠে নিশি কখন যে এমন সুন্দর মালা গেঁথেছে জানিনা। তার মনে যে এমন সুন্দর একটি স্বপ্ন কাজ করছিল তাও কি জানতে পেরেছিলাম! এক কোমর জলে নেমেছি তখন নিশি আঁচলের তলা থেকে মালা বার করল। এই শ্মশানের মতন গ্রামে মড়কের বিভীষিকার মধ্যে এখনও যে এমন সুন্দর ফুল ফোটে, আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। সে আমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে বলল, 'দাদু যা চেয়েছিল পারেনি, মা যা চেয়েছিল পারেনি, বাবা যা চেয়েছিল পারেনি, আমি নিজে তাই পারলাম, করলাম। এ যে আমার কত বড় ভাগ্য তার সাক্ষী ওই সূর্য এই গঙ্গা, সমস্ত চরাচর। তুমি আমার স্বামী।' সে মাথা নত করে বলল, 'আশীর্বাদ কর, বল, সুখী হও।'

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে, ওর কথা শুনে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। একটা প্রবল আবেগে শরীর কাঁপছিল। আমার গলা বুঁজে এল। আমি সম্মোহিতের মতন আমার গলার মালা ওর গলায় পরিয়ে দিলাম। আর্দ্র অস্পষ্ট গলায় বললাম, 'এই সূর্য এই গঙ্গা এই চরাচর সাক্ষী, তুমি আমার বউ। বউ, তুমি সুখী হও।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে নিশি আমার বুকে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। অবশ্য শক্ত হয়ে দাঁড়াতেও বেশী সময় লাগলনা তার। সে সাঁতার কাটল, ডুবুডুবি করল, শেষে যখন পাড়ে উঠল তার শরীরে মনে যেন আর এক বিন্দু শোক নেই। পাড়ে উঠে সে আমাকে প্রণাম করল। তখন সে কি হাসি, সে কি উজ্জ্বল মুখ তার। ভাবাই যায় না, কাল এর বাপ মরেছে—সংসারে এর কেউ নেই, না একটা আশ্রয়; সে নিঃস্ব শোকার্ত অসহায়।

এক বুক তেল নিমেষে পুরিয়ে দিতে চেয়ে প্রদীপের শিখা যেমন করে জ্বলে তেমনি করে জ্বলছিল নিশিলতা। সুখে যেন

থৈ-থৈ করছিল তার সর্বাঙ্গ, মন। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। ওকে বুকে টেনে এনে ওর চোখের মধ্যে তাকালাম, এত সুখের উৎস কোথায়, দেখব। ও খিলখিল করে হেসে উঠে শুধোল, 'দেখছ কি ?' কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না, দেখতে দেখতে নীল-নীল আকাশের মতন চোখ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল, বৃষ্টি নামল ঝেপে, চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল গাল বেয়ে, মুছতে মুছতে বলল, 'আমার সুখ কান্না হয়ে ঝরছে। আহা, আমার দাদু দেখল না, মা দেখল না, বাবা দেখল না। রাজার ছেলে চোখে নক্ষত্রের স্বপ্ন নিয়ে এল আমার স্বামী হতে।' মুহূর্তে আমাকে চুমোয় চুমোয় ভরে দিয়ে বলল, 'ছাড়, রান্না করব না ?'

কোথা কোথা থেকে ঘড়া ঘড়া জল আনল। হেঁসেল নিকলো রান্না বসাল। ডালে চালে সেদ্ধ হতে বেশী সময় লাগে না। দু'জনে যখন খেয়ে উঠলাম তখনও পুবের সূর্য মাথার ওপরে আসেনি। অথচ চৈত্রের রোদে ইতিমধ্যেই খাঁ-খাঁ করছে চারধার। বাইরের দিকে তাকানো যায় না। কিন্তু জাম-জামরুলের ছায়ার নিচে রান্নাঘরটি ভোরবেলার মতন ঠাণ্ডা। কাল রাতে আমরা রান্না ঘরে খড় বিছিয়ে শুয়েছিলাম। আজ কোথা থেকে একটা ছেঁড়া মাদুর কুড়িয়ে আনল নিশি, তেলচিটে একটা বালিশ পর্যন্ত। বিছানা পেতে নিশি আমার গলা জড়িয়ে ধরল— 'আমাদের ফুলশয্যা।'

সেই শয্যায় নিশি আমার বুকে বন্যার ঢেউয়ের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতক্ষণ সে শিখার মতন জ্বলছিল। এখন সে কামার-শালের হাপরের মুখে অগ্নিকুণ্ডের মতন লকলকিয়ে উঠল। উনিশটা বসন্তের ক্ষুধার্ত যৌবন বেবলগা হয়ে আমাকে নিংড়ে নিংড়ে নিঃশেষ করছিল বারে বারে। রতি-ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি আবার জেগে উঠে রমণে উন্মত্ত হয়েছি। শেয়াল কুকুর পেঁচার ডাক শকুনের কান্না হরিধ্বনি পথ-কীর্তন—মৃত্যু-পুরীর কোন বিভীষিকা

আমাদের ফুলশয্যার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনি। নিশিলতার উত্তাল যৌবনের বন্যায় সব ভেসে চলে গেছে, দূরে, বহু দূরে। আমরা যেন অন্য কোন দ্বীপে, দেশে কিংবা গ্রহান্তরে চলে এসেছি। এখানে শোক নেই, ভয় নেই, মৃত্যু নেই। কেবল সুখ, কেবল আনন্দ, কেবল রতিবিলাস।

সে আনন্দে ক্ষুধা তৃষ্ণা—কোন বোধ আমাদের ছিল না। তবু দুপুরের রান্না যা আমরা দু'জনে খেয়েও কিছু ছিল তা মিছে নষ্ট হতে না দিয়ে সন্ধ্যার আগেই খেয়ে নিলাম। খেয়ে বল সঞ্চয় করে আবার আমাদের রতিবিলাস শুরু হল। নিশির যেন আকাঙ্ক্ষার শেষ ছিল না। রতি সুখ যত ভাবে ভোগ করার কল্পনা করা যায় সে আবিষ্কার করেছে আর আমাকে উত্তেজিত করেছে। শেষে আমরা যখন দু'জনেই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছি, নিশিলতা আমার সর্বাঙ্গে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে রইল। দু'জনেই এক সময়ে দু'জনের বুকে ঘুমে অসাড় হয়ে গেলাম।

পরদিন আমার যখন ঘুম ভাঙল, শূন্য বিছানায় আমি একা। শুয়ে শুয়েই দেখছিলাম, উঠোন ভরা রোদ। গাছের মাথায় সূর্য। উঠে বসতেই চোখ পড়ল একখানা সরার ওপরে। লাল রং দিয়ে তাতে পরিষ্কার হাতে লেখা রয়েছে—

স্বামী, দেবতা,

বাবার সঙ্গে ভেসে গেলাম। সেখানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। জানি আমাকে তুমি ভুলতে পারবে না। আমার কানের ফুল দুটি ও তিনটি টাকা তুমি নিও। প্রণাম নাও।

তোমার নিশিলতা

৭

জীবনে সেই প্রথম আমি কেঁদেছিলাম। এক একটি ফুলে সাতটি পাপড়ি মাঝখানে ছোট্ট নীল পাথর। নিশিলতার কানের ফুল দুটি হাতে নিয়ে দু'মুহূর্তের বেশি দেখতে পাইনি, তখনই চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, গাল বেয়ে ধারা নেমে বুক ভিজিয়ে দিয়েছিল।

আমি তখনই উঠে পড়েছি। চোখ মুছে বেরিয়ে পড়েছি, সোজা নদীর ঘাটে চলে এসেছি আমি। না, নিশিলতাকে খুঁজতে নয়। ও-কে যে খুঁজে পাব না সে ত ও নিজেই জানিয়ে গেছে। কাল ভোরে জলের মধ্যে যেখানটায় দাঁড়িয়ে নিশি আমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিল, আমার দৃষ্টি সেখানে নিবদ্ধ হয়ে রইল। স্মৃতি নয় জীবন্ত দৃশ্য, আমি সেখানে আমাকে ও নিশিলতাকে দেখছিলাম। নিশির বুকে মালা আমার বুকে নিশি।

নিশিলতা লিখেছিল: 'জানি আমাকে তুমি ভুলতে পারবে না।' নিশিলতা যেন জীবনের মৌল বোধকেই জেনে ফেলেছিল। তাইত চরম যন্ত্রণা আর পরম সুখ এক সঙ্গে এমন স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখেছিলাম তার চোখে। দেখে তখনও আমার বোধোদয় হয়নি, আমার আরও কিছু শিক্ষা বাকি ছিল যে। যে বোধের রহস্য বেদেনী যাযাবরী থেকে নিশিলতা পর্যন্ত জোড়া-জোড়া চোখের গভীরে আমি নিবিড় হয়ে উঠতে দেখেছি, যে রহস্য আমাকে ঘর-ছাড়া করেছে, পথে পথে নিশিদিন হাতছানি দিয়েছে, আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে দূর থেকে দূরে, সেই রহস্যের মূলে যে অপরূপ আমি তাকে জীবনে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছি, পারিনি

বলেই সেই অপরূপের রূপকার হতে চেয়েছি। রূপকার হবার এই শিক্ষা আমার অসম্পূর্ণ ছিল বলেই আমি নিশিলতাকে সেদিন বুঝতে পারিনি, কুন্তীকে মনে হয়েছিল অনার্যা।

কতক্ষণ নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না, চমকে উঠলাম একমাল্লার একখানা ডিঙির ডাকে, 'কেরায়া যাইবা নি!' যেন সুলতানগঞ্জ যাবার জন্যে নিশিলতাই ডিঙিখানি পাঠিয়ে দিয়েছিল আমাকে।

আমার কথা শুনে গোকুল পালের চোখ ঝিকিয়ে উঠেছিল, বলেছিলেন, 'এমন স্বপ্ন নিয়ে কোনদিন কোন ছেলে আসেনি আমার ছাত্র হতে। আসলে খুব কম মানুষই স্বপ্ন দেখে, তাই অনুকরণ ছাড়া কোথাও আর বড় কিছু চোখে পড়ে না।' তিনি আমাকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর সংগ্রহশালায়। সেখানে তিনি তাঁর নিজের ও কৃতী ছাত্রদের সাফল্যের সঞ্চয় খুব যত্ন করে রক্ষা করেছেন। বললেন, 'তোমার মতন আমিও স্বপ্ন দেখেছি, সে সব স্বপ্ন এই সব মূর্তিতে রূপ দিতে চেয়েছি।' বিস্মিত হয়ে গেছি দেখে— বিরহিনী রাধা, অভিমানিনী রাধা, কামাতুরা রাধা, সুরথ সুখে নিমীলিত-নেত্র রাধা—কী সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্যে জীবন্ত করে তুলেছেন গোকুল পাল। যে আমাকে খুন করতে চেয়ে আমার হাতে খুন হল সেই ডাকাতটার কথা মনে পড়ল, মনে হল, লোকটা গোকুল পাল বলতে ভুলে কংসারি পাল বলেছিল, সে মিথ্যে কথা বলেনি। তার বর্ণনাই ত বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্ছে, ইনিও ত শুধু ঠাকুর দেবতা গড়েননা। যে-কোন মূর্তি গড়েন, আর শুধু মূর্তি গড়েন না, সে-মূর্তির মুখে যে-কোন ভাব জীবন্ত করে ফোটাতে পারেন। এ বিদ্যা আয়ত্ত করা যে কী কঠিন মনে মনে তা অনুমান করে নিরাশ বোধ করেছিলাম, 'এ কি আমি পারব?'

'চেষ্টা না করলে কোনদিন তার জবাব পাবে না। পাহাড়ের

নিচে দাঁড়িয়ে সারা জীবন ভাবলেও পাহাড়ের চুড়োয় ওঠা যাবে না। চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা কর।' উৎসাহ দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন সর্বোপরি দীর্ঘ দিনের অধ্যবসায়ে শেখা সমস্ত দুরূহ কৌশল বুঝিয়ে দিয়েছেন। এতটুকু গোপন করেননি, লুকিয়ে রাখেননি এতটুকু। তাঁর সেই আন্তরিক শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আমার নিষ্ঠা ও মনোযোগ। আমার পদ-যাত্রার পথের পাশে যাদের আমি ফেলে এসেছি, যারা আমার আঁধার পথে প্রদীপের মতন জ্বলে উঠে আমার পথ আলো করে দিয়েছিল আমি তাদের জীবন্ত করে তুলব—আমার সে আকাঙ্ক্ষাও আমাকে ধ্যানমগ্ন হতে সাহায্য করেছে। ফলে কত বর্ষা বসন্ত শীত কেটে গেছে, কত সকাল সন্ধ্যা মধ্যরাতে কুন্তী এসে ফিরে গেছে কিন্তু আমার মনে কোন আঁচড় টানতে পারেনি। আমি দিনে সারাদিন নিভৃতে এক কোণে মাটি খড়ি রং নিয়ে ডুবে থেকেছি। রাতে মধ্যরাত্রি অবধি তুলট কাগজে চারকোল পেনসিল দিয়ে স্কেচ এঁকেছি।

পয়সা ছিল গোকুল পালের। উদারতা ছিল। সম্পূর্ণ সংস্কার-মুক্ত ছিলেন মানুষটি। বউ মরে যাবার পরে আর বিয়ে করেননি, তাই বলে ব্রহ্মচারীও ছিলেন না। যে-কোন মাংসে যে-কোন মদে এবং যে-কোন মেয়েমানুষে তাঁর আসক্তির কোন ব্যতিক্রম ছিলনা। তাঁর মেয়ে কুন্তী সংস্কার-মুক্ত পিতার সে গুণটি পেয়েছিল। সে মদ খেতনা বটে কিন্তু কোন পুরুষে তার অরুচি ছিলনা। আমরা গোকুল পালের দশটি ছাত্র। কুন্তী ছিল আমাদের সকলের জন্যে একটি সাধারণ জলের গ্লাস। সে নির্বিচারে আমাদের সকলের পিপাসা মেটাত।

জলভরা গ্লাস পাশে ঢাকা থাকে; কিন্তু পিপাসা না পেলে যেমন আমরা জল খাইনে তেমনি—স্থূল উত্তুঙ্গ মাংসল দুটি স্তন, বাড়ন্ত কলাগাছের মসৃণ শরীরের মতন সুডৌল দুটি উরু ও

বিপুল নিতম্ব নিয়ে মন্থর পায়ে কুন্তী যখন এসে কাছে দাঁড়াত, যার কাছে এসে দাঁড়াত সে যে তখনই তার কলসির গলার মতন সরু কোমর ধরে তাকে টেনে কাছে নিত তা না, পিপাসা থাকলে তবে নিত। কিন্তু দশজনের কারো না কারো পিপাসা থাকতই, ওকে দেখলে পিপাসা জাগতই, সুতরাং কুন্তী সুখী ছিল। কাম ছাড়া তার চোখে কোন ভাষা ছিল না, সঙ্গমের সুখ ছাড়া তার মুখে কোন লাবণ্য দেখিনি তবু তাকে নিয়ে আমার সতীর্থরা কেউ অসুখী ছিল না।

কেবল সুখ ছিল না আমার মনে। আমার স্বপ্ন আছে সাধ আছে কিন্তু আস্তে আস্তে জেনেছি আমার সাধ্য নেই। যে অপরূপকে আমি মূর্তিতে রূপান্তরিত করতে চাই সে আমার হাতে মূর্ত হচ্ছে না। আমি এক দুরারোগ্য অশান্তি ও অস্থিরতায় ক্রমাগত ভুগছিলাম। আর কেবল অপ্রসন্ন হয়ে উঠছিলাম। তাই কেবলই জেদ বেড়ে গিয়েছিল, সেই জেদে যখন যেমন আদেশ করতেন গোকুল পাল, নির্বিচারে গড়ে গেছি—লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা প্রতিমা জ্বরাসুর ওলাদেবী, দেশের পালপার্বণ পুজোর যত যত ঠাকুর দেবতা। কবে থেকে জানি না, গোকুল পালের প্রচার গুণে কিংবা আমার কৃতিত্বে কেমন করে হাটে বাজারে নগরে বন্দরে দেশান্তরে আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। আমি শানু পাল নামে বিখ্যাত হয়েছি। শানু পালকে দিয়ে প্রতিমা গড়াতে পারলে যেন জীবন ধন্য হয়ে যায় ধনীদের। গোকুল পাল প্রচুর টাকা করে নিচ্ছিল, আমি গ্রাহ্য করিনি। গুরু-ঋণ কেউ শোধ করতে পারে না। তবু গুরু-দক্ষিণা দিতে হয়। তিনি আমাকে খেতে দিয়েছেন, পরতে দিয়েছেন, থাকতে দিয়েছেন, সবার ওপরে সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে তাঁর সাধনার সবটুকু সিদ্ধি আমাকে দান করতে চেয়েছেন অতএব আমার খ্যাতির মূল্য সবই তার ন্যায্য পাওনা।

কিন্তু আমি আর পারছিলাম না। আমার কেবলই মনে

হয়েছে আমি রূপকেই কেবল মূর্তিতে রূপান্তরিত করছি, আমি অনুকরণ করছি কেবল। আর সেই অনুকরণের কথা মনে হতেই আমার হাত অসাড় হয়ে আসত। কাজ কি তবে এই অসাড় শ্রমে—আমি চিন্তা করতাম, যদি সত্তার মৌল বোধই মূর্তিতে আরোপ করতে না পারলাম, তার চেয়ে, আবার পথে বেরিয়ে পড়ব—সেই মৌল বোধকে খুঁজে বেড়াব, রূপে রূপে অরূপের সন্ধান করব আমি। বসন্তর কথাই সত্য হোক, পথ আমার যৌবন জীর্ণ করুক, গায়ে কুষ্ঠ হোক, পোকা পড়ুক, পথের পাশে মরে পচে পড়ে থাকি, আমার হাড় মাংস শেয়ালে শকুনে খাক।

তবু শিল্পের প্রতি অন্ধ মায়া কাটছিল না। মনস্থির করতে পারছিলাম না। বসন্ত গেল, গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা যায়-যায় শরৎ আসন্ন আমি নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় বসে আছি। দেখে দেখে গোকুল পাল অস্থির অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে উঠতে একদিন ক্ষেপে গেল।

'আমি এবার পঞ্চাশখানা প্রতিমা গড়বার বায়না নিয়েছি। তার দশখানা তোমার হাতে গড়া হবে। তুমি এখন পর্যন্ত একখানাতেও হাত দিলে না।' বলতে বলতে গোকুল পালের চেহারা পালটে যাচ্ছিল, এমন পালটে গেল যেন এ আমার চেনা গোকুল পাল নয়, অন্য কেউ আর একজন।

'আমি স্থির করেছি, আমি আর প্রতিমা গড়ব না।' আমি গোকুল পালের সদ্য রূপান্তরিত স্বার্থপর গৃধ্নু চেহারার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সহসা আমার দোদুল্যমান মন কঠিন হয়ে উঠল, আমি আমার সংকল্প স্থির করে ফেললাম। সহৃদয় উদার মানুষটা লোভে লোভে এগিয়ে এসে আজ কোথায় দাঁড়িয়েছে দেখে আমার ঘৃণা হল।

তবু তিনি আমার গুরু। আমি নম্র কণ্ঠে বললাম, 'আমার সাধ্যে যা সম্ভব আমি সাধনা করেছি। আমি জেনেছি, আমার

স্বপ্ন সত্য করে তোলা আমার অসাধ্য। আমি আর নিজেকে প্রতারণা করব না।'

'না আসল কথা বল, দেশে দেশে এখন তোমার খুব খ্যাতি হয়েছে জেনে এখন তুমি আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে ছেড়ে যেতে চাইছ। তুমি স্বার্থপর বেইমান।'

আমার সত্তা শুদ্ধ কেঁপে উঠল। এত বড় মিথ্যার কোন জবাব নেই। আমি চুপ করে রইলাম।

'আমি কী কঠিন পরিশ্রম করে তোমাকে সন্তানের মতন শিক্ষা দিয়েছি, বিখ্যাত করেছি তুমি তা আজ আত্ম-অহংকারে ভুলে যাচ্ছ।'

'না ভুলিনি।' আমি ভীষণ আহত হয়েও শান্ত থাকলাম, শান্ত গলায় বললাম।

'তাহলে তুমি আমাকে আজ এমন অপমানের মধ্যে এমন বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলতে চাইছ কেন? তুমি প্রতিমা না গড়লে আমি কি আর কারো কাছে মুখ দেখাতে পারব? পঞ্চাশ হাজার টাকা অগ্রিম নিয়েছি।'

'ফেরত দিয়ে দিন। বলে দিন শানু পাল অসুস্থ।'

'পঞ্চাশ হাজার টাকা কোথায় পাব?'

'আমার প্রতিমা বিক্রি করে আজ পর্যন্ত আপনি লক্ষাধিক টাকা রোজগার করেছেন।'

'সে টাকা জমিতে বাড়িতে ঢেলেছি। সে সব ত তোমার আর কুন্তীর। আমি স্থির করেছি, কুন্তীকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কাশীবাসী হব।'

'টোপ ফেলবেন না। টাকার কাছে মেয়েমানুষের শরীরের কাছে আমি আমার স্বাধীনতা বেচব না।'

আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

পথে নেমে এলাম। আমি সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম

আমি এতদিন খাঁচায় বন্দী ছিলাম। আমার যাযাবর মন অনেকদিন পর তার গুটানো ডানা মেলতে পেরেছে। মুক্তির আনন্দে আমি যেন হাওয়ায় ভেসে চললাম। কোথায় যাচ্ছি, কত দূরে এসে পড়েছি, আমার খেয়াল ছিল না। এক জায়গায় জন তিনেক লোক পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। চেয়ে দেখি আমার সামনে বন্দরের ঘাট। আমি সুলতানগঞ্জের বন্দরে এসে পড়েছি।

আমার সামনে একজন যুবতী-বউ দু'জন সম্ভ্রান্ত পুরুষ। একজনকে আমি চিনি, তিনি এ বন্দরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রাধিকা সাহা। আমার পথ আগলে আমাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন তিনিই, বললেন, 'শানু এস তোমার সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন কলকাতার একটি বিখ্যাত সূতা-কলের মালিক সুধারঞ্জন চৌধুরী। আর ইনি তাঁর পুত্রবধূ…'

'সুরঞ্জনা'—পুত্রবধূ নিজের নাম বলে মিষ্টি একটু হাসল।

আমি হাত জোড় করে দু'জনকে নমস্কার জানালাম।

সুধারঞ্জন আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, ভেবেছিলাম শানু পাল না জানি কত প্রবীণ এক মৃৎশিল্পী।

'কি যে বল বাবা, এমন যুবক-বয়স আর এমন সুন্দর চেহারা না হলে কি সে এমন অপূর্ব প্রতিমা গড়তে পারে?' সুরঞ্জনা এসে আমার হাত ধরল। 'আমার কল্পনার সঙ্গে তুমি আশ্চর্য মিলে গেছ।'

আমি সুরঞ্জনার দিকে তাকালাম। পাকা আখের মতন রং তেমনি ঋজু সরল ও কৃশ। কিন্তু অঙ্গ ভরে একটি নরম লাবণ্য যেন তক্‌তক্‌ করছে। মনে হবে যেন একটা অদৃশ্য আরশি থেকে প্রতিফলিত হয়ে কিছু কোমল আলো এসে পড়েছে ওর সর্বাঙ্গে, মুখে। আমি ওর লতানে ভুরু চোখের দিঘল পল্লব দেখছিলাম। পল্লবের নিচে অর্ধোন্মেষিত চোখ দুটি আমার ভাল লাগল।

কিন্তু এখন আমার বুক আন্দোলিত দীঘির মতন, অশান্ত টালমাটাল। ওই চোখ মুখ ওই লাবণ্য আমার বুকের কোথাও স্থির স্পষ্ট হয়ে থাকতে পারল না, কেঁপে ভেঙে এলোমেলো হয়ে বারে বারে ছড়িয়ে যেতে থাকল।

আমি সুলতানগঞ্জ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আমি চিন্তা করছিলাম, আমি আর মৃৎশিল্পী না, আজ থেকে মৃৎশিল্পী শানু পাল আর নেই। সে মরে গেছে। যে মৃত বিগত তার প্রশংসা প্রশস্তি শুনে কি লাভ। কোন প্রয়োজন নেই। চিন্তা করে আমি সুরঞ্জনার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলাম। আমি হাত জোড় করে কপালে ঠেকালাম।

'আমার তৈরি প্রতিমা আপনাদের ভাল লেগেছে শুনে খুব আনন্দ পেলাম, নমস্কার। আমি আসি।'

'ছি শানু।' রাধিকা সা যেন ধমকে উঠলেন, 'ওঁরা সেই কলকাতা থেকে লঞ্চে করে সোজা এখানে ছুটে এসেছেন শুধু তোমার সঙ্গে কথা বলবেন বলে।'

'কেন?' আমার প্রশ্নটা রুক্ষ শোনাল। আমি রাধিকা সা'র ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছি।

'ওঁদের ইচ্ছে তুমি কলকাতায় গিয়ে ওঁদের বাড়ির প্রতিমাটি তৈরি করে দাও।'

'আমাকে ক্ষমা করবেন', আমি নম্র হতে চেষ্টা করলাম, আমি কারো দিকে না তাকিয়ে হাত জোড় করলাম, 'আমি প্রতিমা গড়া ছেড়ে দিয়েছি। আজ ছ'মাস মাটিতে হাত দেইনি আমি।'

সুরঞ্জনা হেসে উঠল 'মিছে কথা, তুমি আমাদের এড়াতে চাইছ।'

'সত্যি তাই', সুধারঞ্জন বললেন, 'এ আমাদের এড়ানোর চেষ্টা তোমার। তোমার কে হয় গোকুল পাল জানি না,

আমাদের পত্রের জবাবে জানিয়েছে, এখানে কাজের অত্যন্ত চাপ। নূতন বায়না নিতে পারব না। এবং শান্তনুকে ছাড়তে পারব না কিছুতেই।'

'অতএব তুমি আর প্রতিমা গড়বে না, কথাটা মিথ্যে।' চতুর চোখে তাকিয়ে সুরঞ্জনা হাসল।

'না, মিথ্যে নয়।' আমি হাসলাম না, আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'আমি পেশাদার কারিগর নয়। গোকুল পাল আমাকে অনুগ্রহ করে মূর্তি গড়তে শিখিয়েছেন, তার মানে এ নয় যে, চিরকাল আমি তার হুকুম তামিল করে যাব।'

'তুমি দেখছি গোকুল পালের ওপরে খুব রেগে আছ।' সুধারঞ্জন আমাকে দেখতে দেখতে বললেন।

'না নিজের ওপরে। আমি যা মূর্ত করতে চাই মূর্তিতে তা আনতে পারিনে বলেই হতাশায় দুঃখে আমি মূর্তি গড়া ছেড়ে দিয়েছি।' বলতে বলতে আমার স্বর বিষণ্ণ হল।

'ছেড়ে দিয়ে কী করবে?' সুরঞ্জনা আমার চোখে চোখ রাখতে চেয়ে বলল।

আমি চোখ সরিয়ে নিয়ে বললাম, 'কিছুই করব না, যেদিকে চোখ যায় চলে যাব।'

'তার আগে আমাদের লঞ্চে এসে আমাদের সঙ্গে একটু চা খেতে আপত্তি আছে?' সুরঞ্জনা আবার আমার মুখে দৃষ্টি পাতল।

এবার আমি সৌজন্য দেখাবার সুযোগ পেয়ে মুখ তুললাম। হেসে বললাম, 'না।'

'বাঃ এইত সুবোধ ছেলের মতন কথা।' সুরঞ্জনা হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরল।

সুধারঞ্জন আর রাধিকা সা একপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। সুরঞ্জনা বলল, 'বাবা তুমি এস, আমরা লঞ্চে যাচ্ছি।'

আমার হাতটা দলা পাকাচ্ছিল সুরঞ্জনা। নিঃশব্দে কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, 'তোমার হাতটি কি নরম, বুঝি হাত এমন নরম না হলে অমন রমণীয় মূর্তি গড়া যায় না।'

'আমার তৈরি মূর্তি কোথায় দেখলেন আপনারা ?'

'গেলবার আসানসোলে। আমি সেই প্রতিমাকেই ব্রোঞ্জে ট্রানসফার করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যাঁদের পুজো তাঁরা রাজী হলেন না। আমি পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলাম: কিন্তু ভীষণ রক্ষণশীল মানুষ, বললেন, পুজো করে ঠাকুর ভাসান না দিলে পাপ হয়। আমি তখনই প্রতিজ্ঞা করেছি, এ বছর শানু পালকে দিয়ে প্রতিমা গড়াব। তাই ত গোকুল পালের চিঠি পেয়ে শ্বশুরমশায়কে নিয়ে ছুটে এসেছি। কিন্তু যাই বল, শানু পাল নামটা তোমার আদৌ মানায় না। বিছ্ছিরি।'

'লোকে বিছ্ছিরি করে ডাকলে আমি কি করব ? আমার নামটা তাই বলে বিছ্ছিরি নয়।'

'তোমার সুশ্রী নামটা কি ?'

'শান্তনু, শান্তনু সেনগুপ্ত।'

'নিশ্চয় এ নাম রেখেছিলেন তোমার মা।' সুরঞ্জনা চুপ চোখে হাসল।

'ঠিক তাই, কিন্তু কি করে জানলেন ?' অবাক হল শান্তনু।

'মা যখন ছেলের নাম রাখে তখন সে তার যৌবনের রূপটি চিন্তা করে।' সুরঞ্জনা তার গলার স্বর খাট করে বলল, 'মা তার ছেলের যৌবনের মধ্যে প্রবীণ স্বামীকে দেখতে চায়। বাপ চায় তার মেয়ের মধ্যে বিগত-যৌবন স্ত্রীকে দেখতে। সুরঞ্জনা আমার বাবার দেওয়া নাম। মা নাম রেখেছিল সর্বাণী। বিছ্ছিরি।' সুরঞ্জনা নাক কুঁচকোল।

কথা বলতে বলতে আমরা লঞ্চে এসে উঠেছি। সুরঞ্জনা বলল, 'চল ছাদে গিয়ে বসি। পড়ন্ত বেলার নদী দেখতে আমার

খুব ভাল লাগে।' সিঁড়িতে পা দিয়ে সুরঞ্জনা একটি উর্দিপরা মানুষকে হুকুম করল, 'বয়, আমাদের চা উপরে দিয়ে যাবে।'

সুরঞ্জনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে, পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আমার বিশৃংখল মন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছিল। বুঝতে পারছিলাম আমার অস্থির মনের ওপরে সুরঞ্জনার লাবণ্যের স্পর্শ সান্ত্বনার কাজ করছে। তাই চা খেয়েই লঞ্চ থেকে নেমে যাব জেনেও ওর সঙ্গে ছাদে গিয়ে বসলাম। টেবিল চেয়ার পাতা বসবার সুন্দর একটি ব্যবস্থা আমাকে তৃপ্তি দিল।

সুরঞ্জনা শুধোল, 'তুমি বলছ সেনগুপ্ত তবে পাল হলে কী করে?'

'মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে ছিলাম।'

'কবে?'

'সে প্রায় বছর দশ হবে।'

'পালিয়ে এখানে এসে উঠলে?'

'না, সে এক দীর্ঘ পথ-হাঁটার ইতিহাস।'

'বল।'

'দু'কথায় তা শেষ করা যাবে না। ওই দেখুন, চা এসে গেছে। আমি আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছি। চা খেয়েই চলে যাব।'

'তাই নাকি?' সুরঞ্জনা হাসল।

বয় টেবিলে চা জলখাবার সাজাচ্ছিল। তাকে শুধোল, 'বয়, বাবা লঞ্চে এসেছেন?'

বয় জবাব দেবার আগেই সুধারঞ্জন এসে বসলেন। 'কি, শানুকে রাজী করাতে পেরেছ?'

'আমি ত বলেছি, আমি আর প্রতিমা গড়ব না।' আমি সুরঞ্জনার আগেই জবাব দিলাম।

যেন একটু উত্তেজিত হলেন সুধারঞ্জন, চায়ের কাপে একটা

চুমুক দিয়ে হাসলেন, 'শান্তুবাবু, আমার সুরঞ্জনা মায়ের ইচ্ছা আজ পর্যন্ত কখনো অপূর্ণ থাকেনি। আমার দুটো কলিয়ারি একটা সুতা-কল কলকাতার পাঁচখানা বাড়ি প্রয়োজন হলে বিক্রি হয়ে যাবে কিন্তু আমার মায়ের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না।'

'বাবা, তুমি সারেঙকে লঞ্চ ছাড়তে বল।'

'তার আগে আমাকে নামিয়ে দিন।' আমি উঠে দাঁড়ালাম।

পলকের জন্যে সুরঞ্জনার ঠোঁট শক্ত ও চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। তখনই সকৌতুক হাসিতে প্রসন্ন হল আবার। বলে উঠল, 'বাব্বা, ছেলের কি তেজ দেখ কিন্তু তুমি ত যেদিকে চোখ যায় যাবে বলেছ সুতরাং কলকাতা যেতে নিশ্চয় তোমার আপত্তি নেই।'

'কিছুমাত্র না।' আমি হাসলাম। এবং তখনই গম্ভীর হয়ে উঠে বললাম, 'কিন্তু আমি আবার বলছি, প্রতিমা আমি গড়ব না।'

'চল ত কলকাতা, প্রতিমা গড়বে কিনা তখন দেখা যাবে। এখন চা খাও', ঠোঁট টিপে হাসল সুরঞ্জনা, 'চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

হাসি দিয়ে জেদ ঢেকে রাখতে চাইছে ধনীর রূপসী ছেলের বউ! আমি চায়ে পর পর কয়েকটা চুমুক দিলাম, আমার মন অপ্রসন্ন অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল, ক্রোধ বোধ করছিলাম। চা খেতে খেতে নিজেকে কিঞ্চিৎ সংযত করে বললাম, 'জোর করে মানুষকে জেলে আটকানো যায়, তাকে দিয়ে পাথর ভাঙানো যায়, তাকে দিয়ে ঘানি টানানো যায়, কিন্তু প্রতিমা গড়ানো যায় কি?' সুধারঞ্জনের মুখে চোখ রেখে জানতে চাইলাম।

'জানি না।' সুধারঞ্জন হাসলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যে জানে তাকে জিজ্ঞেস কর।' সুরঞ্জনাকে বললেন, 'আমি নিচে যাচ্ছি সুরঞ্জনা, নদীর বাতাসটা ঠাণ্ডা, তোমরাও বেশীক্ষণ উপরে থেকো না।'

'তুমি যাও, আমরা আসছি।' সুরঞ্জনা চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা রাখল, আমাকে বলল, 'শান্তনু, তোমার প্রশ্নের জবাব আমি কলকাতা গিয়ে দেব।'

সুধারঞ্জন নিচে গিয়ে সারেঙকে হুকুম করেছেন। লঞ্চ চলতে আরম্ভ করেছে। চাষীদের জেলেদের ছোট ছোট ডিঙিগুলিকে টালমাটাল করে কাদাখোঁচা বক হাড়গিলেদের সন্ত্রস্ত করে লঞ্চের প্রপেলারের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত জল এসে পাড়ে প্রবল বেগে আছড়ে পড়ছে। ছুটে চলেছে লঞ্চ—মহাজনদের গদি গুদোম বাজার, দেখতে দেখতে গোটা বন্দরটাই পিছনে মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগেও যা বর্তমান ছিল এখন তা অতীতের স্মৃতি মাত্র। অনেক বর্ষা বসন্ত শীত যে আটচালার কোণে বসে নিভৃতে শিল্প-সাধনা করেছি তার কথা মনে পড়ল না, এমন কি কুন্তীকেও না। সামনে আমার কলকাতা। সামনে আমার সুরঞ্জনা।

মাথার ওপর দিয়ে পানকৌড়ি বকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। সূর্যাস্তের রঙে পশ্চিম আকাশটা যেন রক্ত মাখা। নদীর পারে দূরে ক্ষেতে মাঠে বনের শীর্ষে অল্প অল্প কুয়াশা। কাশ ফুলের অরণ্য, শূন্য ক্ষেত, মাঠ, গাছগাছালি, গ্রাম, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে উজিয়ে চলেছি আমরা।

সুরঞ্জনা আমাকে দেখছিল, আমি আকাশ নদী চরাচর।

সুরঞ্জনা আমার হাতে হাত রাখল। 'তুমি প্রতিমা গড়বে না, তাই বলে জীবনের গল্প বলতেও আপত্তি?'

'না।'

'তবে বল। কথা বল। চুপ করে থেকো না।'

দেখতে দেখতে নীল আকাশ কালো হয়ে এল। একটি দু'টি করে সমস্ত আকাশ তারায় তারায় ছেয়ে গেছে। বাতাস ছুটছে হুহু করে, লঞ্চের একঘেয়ে শব্দে নির্জনতা নিবিড় হয়ে উঠেছে। সেই শব্দিত নির্জনতা ও লক্ষ তারার অন্ধকারে বসে সুরঞ্জনাকে

আমার জীবনের সব কাহিনী বলেছি। এখন ভাবি, আহা, কেন নিশিলতার কাহিনীটা ওকে বলতে গেলাম।

সুরঞ্জনার স্বামী বাইরে আছেন। আসতে সেই পুজোর দিনে। এখানে শুধু সুরঞ্জনা আর সুধারঞ্জন। বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ি, দু'টি মানুষের প্রয়োজনের অনেক অতিরিক্ত ঝি চাকর রাঁধুনী দারোয়ান তবু এত বড় বাড়িতে সব যেন অকিঞ্চিৎকব, বাড়িটার গম্ভীর নির্জনতার মধ্যে সবাই যেন তলিয়ে যায়, তলিয়ে থাকে।

বিরাট দেউড়ি পেরিয়ে মস্ত উঠোন। তার উত্তর প্রান্তে সম্পূর্ণ শ্বেত পাথরে তৈরি নানা কারুকাজ করা নাটমন্দির। সুরঞ্জনা আমাকে এনে সেখানে বন্দী করেছে। টিন দিয়ে ঘিরে দিয়েছে সবদিক। ভিতরে টেবিল চেয়ার, আরামকেদারা, পুরু আর নরম গদি আঁটা খাট। আরামের এতটুকু ব্যাঘাত যেন না ঘটে, সবদিকে লক্ষ্য রেখেছে। বাইরে মজুর ম্যানেজার চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েন—যা করতে বলব করবে, যা চাইব এনে দেবে। কুমারটুলী থেকে একজন কুমার পর্যন্ত আনা হয়েছে আমাকে সাহায্য করতে। ব্যবস্থার ত্রুটি কোথাও নেই। কেবল প্রেরণার অভাব।

খড়ের জায়গায় খড় মাটির জায়গায় মাটি পড়ে রইল, কাঠামোর পরিকল্পনাটা পর্যন্ত করিনি এখনো। আমি কখনো খাটের ওপরে টানটান হয়ে শুয়ে থাকি, কখনো আরামকেদারায় অর্ধশায়িত হই। কখনো টেবিলে কনুই হাতের চেটোয় গাল আমি মাথা নিচু করে চেয়ারে বসে কাগজে দাগ কাটি—একটা স্কেচ এখন পর্যন্ত আমার মাথায় আসেনি। আমি জেদ করে বলেছিলাম, আমি আর প্রতিমা গড়ব না। এখন হতাশ হয়ে ভাবছি, আমি আর প্রতিমা গড়তে পারব না। গোকুল পালের অভিশাপ নয়ত?

আমার হাসি পায়। আমি বন্দী শাজাহানের মতন পায়চারী করি আর চোখ বুজে নিজের ভিতরে তাকাই। একটা নিরাকার স্তূপ স্তূপ অন্ধকার ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। আমার পদ-যাত্রার পথে পথে যত প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল সব একটি একটি করে নিভে গেছে। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সব রূপ যেন অন্ধকারে একাকার। আমি আজ রূপেরও রূপকার নই—অরূপের ত নই, সে-ত নিরন্ধ্র অন্ধকার হয়ে আছে। মিথ্যা সাধনার এই পরিণাম অনেক আগেই আমি জেনেছিলাম। জেনে নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম, বাইরে থেকে তা কেউ বুঝতে চায়নি, না গোকুল পাল, না সুরঞ্জনা। বাইরে থেকে কেউ বুঝি তা বুঝতে পারে না, ভাবে সাধ্যায়ত্ত নিপুণতা আর অনুশীলনই প্রতিভা, প্রেরণা একটা মিথ্যা কথা। তাই তারা ধরে এনে জেলে বন্দী করে, জোর করে, বাধ্য করে শিল্পীর কাছ থেকে কীর্তি আবিষ্কার করতে চায়। তা যে পারা যায় না, ফুল যে ফোটার সময় হলে আপনি ফোটে, গায়ের জোরে অর্থের অহংকারে ইচ্ছা মতন ফোটানো যায় না—বুঝুক এখন।

আমি টের পাই, আমার দৃষ্টির আড়ালে থেকে সুরঞ্জনা দেখছে সব। দেখছে আর এতবড় বাড়ির কোনো এক ঘরে আমার মতনই পায়চারী করছে, ছটফট করছে।

শেষে অস্থির হয়ে সুরঞ্জনা এসে দাঁড়াল আমার সামনে।

'তুমি প্রতিমা গড়বে না?' মলিন বিষণ্ণ প্রশ্ন।

'প্রেরণা পাচ্ছিনে।' বিপন্ন কাতর উত্তর দেই আমিও।

'তুমি কি ভাব তুমি সত্যি অরূপকে, অদৃশ্য বোধকে, মূর্তিতে মূর্ত করতে পারবে? তুমি সেই প্রতীক্ষায় বসে আছ? অরূপ তোমার চিন্তায় মূর্তি লাভ করলে তবে মাটিতে হাত দেবে?'

আমি চুপ করে রইলাম, আমার দুরূহ সাধনার কথা কতবার আর পুনরাবৃত্তি করব।

সুরঞ্জনা কিন্তু থামল না। 'তুমি যে বোধকে পুনঃপুন তোমার সত্তার মধ্যে অনুভব করেছ সে কি রূপের মধ্যে দিয়ে তোমাকে স্পর্শ করেনি, তুমি কি নিরাকার কিছুর মধ্যে দিয়ে তাকে স্পর্শ করতে পেরেছ?'

তবু আমি নিরুত্তর। সে আমার দু'কাঁধ ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'উত্তর দাও শান্তনু, তুমি কি রূপের মধ্যে তোমার অরূপের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করোনি?'

'করেছি।' আমি আস্তে জবাব দিলাম।

'তাই সবাই করে, তার বাইরে, এই রূপের বাইরে, আর কোন কিছুকে মানুষ ধরতে পারে না, ধারণায় আনতে পারে না। এই বিশ্ব প্রকৃতির ভিতরে থেকে মানুষ এই বিশ্ব-প্রকৃতির বাইরেকার কিছুকে কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারবে না। কেউ কোনদিন পারেনি। তুমি অবাস্তব অসম্ভব চেষ্টা ছাড়। যেমন করছিলে তাই কর, রূপকে অপরূপে রূপান্তরিত কর।'

'সে রূপকেও আর আমার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না। আমার ভিতরটা সম্পূর্ণ অন্ধকার।'

'তুমি রূপ খুঁজে পাচ্ছ না শান্তনু?' কুলকুল করে হেসে উঠল এবার সুরঞ্জনা। চোখ বুঁজে নিজের মধ্যে ডুব দিলে কি রূপ খুজে পাবে? রূপ বাইরে। এই দেখ।'

সুরঞ্জনা নিমেষে তার সমস্ত আবরণ খুলে ফেলে আমার সামনে তার অনাবৃত লাবণ্য তুলে ধরল। চোখে তার কামনা জ্বলছিল, সর্বাঙ্গে রিরংসা কাঁপছিল থরথর করে। একটা ক্ষুধা যেন উত্তপ্ত শিখায় লকলকিয়ে উঠল। এমন করে জ্বলে না উঠলে যেন আমার এ অন্ধকার ভিতরটা দেখতে পেতাম না। আমি শিউরে উঠলাম।

আহ্, এমন করে সুরঞ্জনা যদি আমার ভিতরটা না জ্বালিয়ে দিত এমন সর্বনাশ বুঝি ঘটত না। আমি অবচেতন চোখে

দেখতে পেলাম, এ শরীরে গোটা জীবনকে এক মুহূর্তে ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা নেই, চরম যন্ত্রণা আর পরম সুখের নক্ষত্র-জ্যোতি নেই এ চোখে। আমি হতাশায় চোখ বুজে ফেললাম। সুরঞ্জনা আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সুরথ-সুখে অর্ধচেতন সুরঞ্জনা অনেকক্ষণ পরে বলল, 'আমার রূপকে তুমি মূর্তিতে রূপান্তর কর শান্তনু, আমি তোমার প্রতিভার সৃষ্টির মধ্যে অপরূপ হয়ে উঠতে চাই, শান্তনু, বড় সাধ আমি শিল্পীর ধ্যানের মধ্যে অমর হব।'

'তাই হবে।' আমি উঠে বসলাম, 'তোমাকেই আমি তৈরি করব। নূতন করে সৃষ্টি করব মাটিতে খড়িতে রংয়ে।' আমি সুরঞ্জনার রূপের আলোতে বিহ্বল চেতনায়, অবচেতন মনের বোধের প্রেরণাকে চিনতে পারলাম না।

সুখে হাসল সুরঞ্জনা, 'প্রেরণা হতে পেরেছি?'

'হ্যাঁ।' আমিও উজ্জ্বল চোখে হেসে জবাব দিলাম।

একবার পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেলে কাজ এগুতে কতক্ষণ! সারাদিন পরিশ্রম করি মূর্তি নিয়ে, সারারাত বিশ্রাম করি সুরঞ্জনাকে নিয়ে। সারাদিন সুরঞ্জনা মণ্ডপে ঢোকে না, পাছে আমার মন চঞ্চল হয়, আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। সে আসে গভীর রাত্রিতে সারাদিনের শ্রম অপনোদন করতে, আগামী দিনের কাজে প্রেরণা সঞ্চার করতে। কানে কানে বলে, 'শিল্পী, তোমার বুকের মধ্যে শুয়ে আমি যদি তোমার সত্তার স্বপ্ন হয়ে যেতে পারি আমার রূপ তবে নিঃসন্দেহে মূর্তিতে অপরূপ হয়ে উঠবে।'

'নিশ্চয় উঠবে।' আমি তাকে দু'হাতে বুকে টেনে প্রতিশ্রুতি দিই।

এক ধনগর্বিতা অমরত্ব-আকাঙ্ক্ষিনী রূপসীর ইচ্ছা পূর্ণ করতেই আমাকে এখানে বন্দী করা হয়েছে। তাকে মূর্তিতে

উৎকীর্ণ করাই আমার মুক্তির শর্ত—আমি নিষ্ঠার সঙ্গে সে শর্ত পালন করে যাচ্ছিলাম। অতন্দ্র ধ্যানে তন্ময় তন্নিষ্ঠ হয়ে কাজ করে যাচ্ছিলাম। পঞ্চমীর দিন আমি চক্ষুদান করলাম। উঁচু টুলটা থেকে নেমে এসে সেই চোখের দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ আমার মাথাটা ঘুরে গেল, তাই দেখেই যেন প্রতিমার ভিতর থেকে একটা মধুর মৃদু রিমরিমে হাসি ছড়িয়ে পড়ল আমার মনের আকাশে, যেন গোটা মণ্ডপই সে হাসিতে ছলছলিয়ে উঠছিল। শুধু চোখ নয় দেবীর সমস্ত অঙ্গই যেন সেই গোটা জীবনকে কয়েক পলকের জীবনে সংক্ষিপ্ত করে জ্বলে ওঠার প্রবল শিখা, চোখে তারই চরম যন্ত্রণা ও পরম সুখের নক্ষত্র-জ্যোতি।

আমি আকুল হয়ে বলে উঠলাম, নিশিলতা তুমি ঠিকই জেনে ছিলে, আমি তোমাকে ভুলতে পারব না। ভুলতে পারিনি যে, ভুলতে পারব না যে, এখন তা জানলাম। আমি কেবল সে সত্যটাকে সচেতন মন থেকে মুছে ফেলে ছিলাম। কেননা আমি ত তোমার মতন নিঃশেষে জীবনের মৌল বোধকে জেনে ফেলতে পারিনি। কেমন করে তুমি পেরেছিলে? আমি কেন এখনও পারছি না? আমি আবেগে আকুল হয়ে অনেকক্ষণ উপুড় হয়ে পড়ে রইলাম তারপর উঠে নিশিলতার কানের ফুল দুটি, এতকাল যা আমি পরম যত্নে কোমরের তাগার সঙ্গে কবচের মতন ধারণ করেছিলাম ও নিত্য-স্পর্শে তার অস্তিত্ব ভুলেছিলাম, দেবীর দু'কানে পরিয়ে দিলাম। এটুকু অসম্পূর্ণতাও আর রাখতে সইছিল না। শেষে একখানা সাদা মলমল দিয়ে ঢেকে দিলাম দেবীর মুখ। এখন ভাবি, আহ্, এই তুচ্ছ অসম্পূর্ণতাটুকুও অন্তত যদি রেখে দিতাম।

ঘুমুচ্ছিলাম। অস্থির চঞ্চল উদ্‌গ্রীব সুরঞ্জনা আমাকে ঠেলে তুলল। 'শুনলাম, প্রতিমা গড়া শেষ। আশ্চর্য, তুমি ত আমাকে ডেকে পাঠাও নি! এস, দেখব।'

'এখন ত বিকেল, মণ্ডপ অন্ধকার, দেখবে কেমন করে?'

'বল কি তুমি, সেখানে হাজার পাওয়ারের পাঁচটা আলো দিয়েছি।'

'কৃত্রিম আলোতে না, কাল দিনের আলোতে দেখবে।'

'কাল সকালেই যে উদ্বোধন, মন্ত্রী উপমন্ত্রী বিশিষ্ট শিল্পপতিরা আসবেন, মুখ্যমন্ত্রী আবরণ উন্মোচন করবেন। আমি তাঁদের সকলের আগে তোমার সঙ্গে একাকী দেখব না?'

'না, কাল সকলের সঙ্গে তুমি দেখবে। তোমার জন্যে একটি বিস্ময় লুকিয়ে রাখলাম আজকের মতন।'

যেন বড় হতাশ হয়েছে সুরঞ্জনা, যেন হঠাৎ কেউ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছে জ্বলন্ত শিখা। সুরঞ্জনার চোখের দীপ্তি নিমেষে অন্ধকার হয়ে গেল। তবু আমার চোখে চোখ রেখে তার অস্থির আগ্রহের দৃষ্টি-প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করে বলল, 'বেশ, তোমার জন্যেও আমি তবে একটি উপহারের বিস্ময় লুকিয়ে রাখলাম।'

'আচ্ছা।' আমি হাসতে চেয়ে শিউরে উঠে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

সর্বনাশের মুহূর্তটি হাজার মানুষের পায়ে পায়ে, মুগ্ধ বিস্মিত চোখে চোখে, বিপুল হর্ষধ্বনি ও উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি-বাচনের মধ্যে এগিয়ে এল। শুধু বিশিষ্ট অতিথিরা না, শানু পালের তৈরি প্রতিমা দেখতে নাট-মন্দিরের বিরাট উঠোন ছাপিয়ে, দেউড়ি ছাপিয়ে, জনতার ভিড় রাজপথ পর্যন্ত ভরে ফেলেছিল।

এত যে প্রশংসা, এত যে পিঠ চাপড়ানো, এত যে সম্বর্ধনা কিছুতে আমার বুকের দুর্বিষহ ভারটা নামছিল না। আমি একবার মাত্র নিমেষের জন্যে সুরঞ্জনার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, সে একটি নিমেষও আমি তার চোখের জ্বালা সহ্য করতে পারিনি। সেই যে চোখ নামিয়ে নিয়েছি আর চোখ তুলিনি।

সব লোক চলে গেলে সুরঞ্জনা আমাকে ডেকে পাঠাল। আমি চরম দণ্ড নিতে মাথা হেঁট করে এসে দাঁড়ালাম।

সুরঞ্জনা ছুটে এসে আমার দু'কাঁধ ধরে প্রবল ঝাকুনি দিয়ে বলে উঠল, 'এ কার মূর্তি তুমি তৈরি করেছ, বল, কার মূর্তি? কার, কার?'

'তুমি বিশ্বাস কর সুরঞ্জনা, আমার অবচেতন মন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমার সজ্ঞান মনে তুমিই অনুক্ষণ উজ্জ্বল হয়েছিলে।'

'মিথ্যা কথা! শঠ, প্রবঞ্চক, আমার সর্বস্ব নিয়ে তুমি আমাকে প্রতারণা করেছ। তোমার নিষ্ঠুর উপহাস যাতে আমার মর্মমূল পর্যন্ত বিদ্ধ করে, তুমি নিশিলতার কানের ফুল দু'টিকেও মূর্তির কানে পরিয়ে দিতে ভুল করোনি! আমি কী ক্ষতি করেছিলাম তোমার, কী অপরাধ করেছিলাম তোমার কাছে? তুমি আমার জীবনের সব স্বপ্ন কেড়ে নিলে, বেঁচে থাকার সব সম্বল কেড়ে নিলে, কেন, কেন, কেন?' দুঃখে ক্ষোভে ভেঙে পড়তে গিয়ে ক্রোধে জ্বলে উঠল সুরঞ্জনা। 'শিল্পীর ছদ্মবেশে আসলে তুমি একটা জঘন্য পশু, নৃশংস ডাকাত, বেরোও এখান থেকে, বেরোও, বেরোও।'

হাতের সামনে একটা গ্লাস ছিল। তাই তুলে প্রাণপণে আঘাত করল আমার মাথায়। আমার কানের কাছে জুলপির হাড়ে গ্লাসটা ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেয়।

কোঁচার খুঁট দিয়ে চাপা দিলাম ক্ষতটা। রক্ত বেরোতে দিলাম না। আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। নেমে এলাম রাস্তায়।

সারাদিন আমি পথে পথে ঘুরেছি। মাথার আঘাতটা সারাক্ষণ টনটন করেছে তবু সুরঞ্জনাকে মনে পড়েনি একবার। শুধু নিশিলতাকে ভেবেছি। শুধু নিশিলতা আমাকে আচ্ছন্ন আবৃত করে রেখেছিল সব সময়। আমার মনে হয়েছে, রূপ বিদেহী হলে তবেই সে এসে সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে, অস্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। তাই সে অবচেতনের গভীরে এসে

শিল্পের প্রেরণা হয়। আত্মপ্রকাশ করে চিত্রে ভাস্কর্যে সঙ্গীতে কাব্যে, জীবনের নানা কর্মে ও সাধনায়। এজন্যেই সর্ব রূপে আমার মা আমাকে এমন করে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ জন্যেই নিশিলতা এমন করে আমার মূর্তিতে মূর্ত হয়েছে।

নিশিলতাকে, আমার সত্তায় সংলগ্ন বোধকে আমার সৃষ্টির মধ্যে আর একবার দেখতে, অনুভব করতে, আমি ফিরে এলাম সুধারঞ্জনের বাড়ির দেউড়ির সামনে।

কোথায় উজ্জ্বল আলোর সজ্জা, জনতার কোলাহল, উৎসবের উত্তেজনা—সব নীরব স্তব্ধ অন্ধকার!

'কী ব্যাপার? আজ না পুজো, বাড়ির দেউড়ি বন্ধ কেন? আলো জ্বলছে না কেন কোথাও?'

'বহুৎ আপসোস কি বাত বাবুজি, মেমসাব সুই-সাইড কিয়া?'

এতক্ষণে আমার সমস্ত জীবন ছাপিয়ে, নিশিলতাকে ঢেকে দিয়ে মুছে ফেলে, আমার ভিতরকার স্তূপ স্তূপ অন্ধকার তার অলৌকিক লাবণ্যে উজ্জ্বল করে সুরঞ্জনা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি দেওয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজলাম।

আমার মা, যাকে আমি দেখিনি, যার বিদেহী অস্তিত্বকে আমি কেবল অনুভব করেছি ভিন্ন ভিন্ন বোধে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে, যার টানে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে ক্রমাগত দূর থেকে দূরান্তে চলে এসেছি, ভেবে এসেছি, এই ভিন্ন ভিন্ন রূপ থেকে একটি সাধারণ রূপ, এই ভিন্ন ভিন্ন বোধ থেকে একটি সাধারণ বোধ সংগ্রহ করে তিলে তিলে আমার মাকে আমি তিলোত্তমা করে গড়ে তুলব মূর্তিতে—যে দেখবে সেই ভাববে এই তার নিজের মা, তার নিজের মায়ের অন্তরের রূপ। যেন তার মাকেই সামনে রেখে গড়া হয়েছে এই মূর্তি। সেই সর্বজনিক মাকে, বিশ্বজননীকে, মূর্ত করবার স্বপ্ন দেখতে দেখতে কোথায় এসেছি আজ আমি? আমি আজ এ, স্টক কম্পানির কারখানার দিন-মজুর। সকাল সাতটায় কারখানায় ঢুকি বিকেল পাঁচটায় বেরিয়ে আসি। কেননা আমি আজও সেই সর্বজনিক সর্বদেশিক সর্বকালিক চিরন্তন কোন বোধকে, কোন রূপকে কখনো দেখতে পাইনি, খণ্ড ছিন্ন বিভক্ত হয়ে দেশে কালে জনে জনে তা কেবল খণ্ডিত হয়ে আমার বোধকে স্পর্শ করেছে। সে খণ্ডিত রূপ ও বোধকে অখণ্ড রূপে ও বোধে রূপান্তরিত করতে চেয়ে ব্যর্থতার প্রতীক গড়েছি শুধু। আমার সে ব্যর্থতার পাপের বলি হয়েছে সুরঞ্জনা। সুরঞ্জনার মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে? নিজেকে বার বার প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পাইনি কিন্তু মনে হয়েছে, দায়ী আমার অক্ষমতা। কিংবা আমার পবিত্র শিল্প-ভাবনাকে দূষিত করতে বদ্ধপরিকর রূপগর্বিনী সুরঞ্জনার

ওপরে শোধ নিয়েছে নিশিলতা, আমি জানি না। আমি শুধু জানি, নিশিলতাও আমার শিল্প-ভাবনার বিশুদ্ধ রূপ নয়। আসলে আমি কখনোই আমার শিল্প-ভাবনার বিশুদ্ধ-বোধে পৌঁছতে পারিনি, তাই আমি বুঝতে পারিনি নিশিলতাকে, বুঝতে পারিনি সুরঞ্জনাকে। আমার সে ব্যর্থতাই আমার শিল্প-সত্তার অপমৃত্যু ঘটিয়েছে, সুরঞ্জনার মৃত্যুর পরে অনেক চেষ্টা করেও আর মূর্তি গড়তে পারিনি। যে-মৃত্যু আমার ঘটেছিল গোকুল পালের বাড়িতে সেই মৃত-দেহ বহন করে নিয়ে এসেছিলাম সুরঞ্জনার বাড়িতে, তার মৃত্যু ঘটিয়ে আজ আমি নিজেই মৃত শটিত প্রেতায়িত।

আমি এখন কারখানার এক অশিক্ষিত দিন মজুরের জীবন যাপন করি। আর অবসরে বসে বসে আমার জীবনের পর্যালোচনা করি। আমি আমার মৃত জীবন সামনে করে বুঝতে চাই —কেন আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলাম। আমার পদ-যাত্রার পথে পথে কী পেয়েছিলাম, কিসের ভুলে কার ভুলে আজ আমি মৃত শটিত প্রেতায়িত। কিন্তু অতীত খুঁটে খুঁটে পর্যবেক্ষণ করেও আবিষ্কার করতে পারিনি তাকে। সে ব্যর্থতায় যন্ত্রণায় আমি মদ খাই বেশ্যা বাড়ি যাই বিছানায় পড়ে হাহাকার করি। আমি দৈনন্দিন জীবনের নিদারুণ ঘৃণার মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করেছি, পচছি আমি, পচে গলে যাচ্ছি। আমার সেই মৃত শটিত জীবনের দরজায় এক ভোরবেলা আমার জীবনের পরম বিস্ময়কে কুড়িয়ে পেলাম।

দরজা খুলে দেখি এক ভিখারিনী আমার দুয়োরে পড়ে আছে, মৃত কি মূর্ছিত বুঝতে না পেরে সামনে এসে নিশ্চিন্ত হতে গেছি—তখন দেখি। এত বড় বিস্ময়কে বিশ্বাস করতে না পেরে আমি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কতক্ষণ পরে জানি না আমি চেতনায় এসেছি, মানুষটির প্রাণ পরীক্ষা করতে তার গায়ে হাত দিয়েছি। সে চমকে উঠে বসল।

জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল তার শুষ্ক মুখ কোটরাগত চোখ; শীর্ণ শরীর কেঁপে কেঁপে উঠল কয়েকবার। সে কথা বলতে পারছিল না। আমার দিকে বোবার মতন তাকিয়ে থাকল।

আমি আর আত্ম-সম্বরণ করতে পারলাম না, ওকে বুকের মধ্যে টেনে তুলে নিলাম।

'কুন্তী কুন্তী, তুমি কোথা থেকে এলে, কেমন করে এলে, কে তোমাকে আমার ঘর চিনিয়ে দিল?'

'ভালবাসা।' আস্তে অতিশয় সন্তর্পণে উচ্চারণ করল কুন্তী। যেন এক অতি মূল্যবান বস্তু আমার হাতে তুলে দিয়ে সে হালকা হল এমনভাবে মাথাটা এলিয়ে দিল আমার বুকে। আমি তাকে বুকের মধ্যে করে আহত পাখির মতন সাবধানে তক্তপোষে শুইয়ে দিলাম।

কেমন করে জানব আর ন'জনকে ছেড়ে কুন্তী শুধু আমাকেই ভালবেসেছিল। ও যে কাউকে ভালবাসতে পারে তাই ত আমার ধারণা ছিল না। ওর চোখে আমি শুধু দেখেছি সঙ্গমের সুখ, সর্বাঙ্গে দেখেছি আসক্তির লাবণ্য, ভালবাসার আলো কখনো ওর চোখে জ্বলতে দেখিনি। কিন্তু ভালবাসলেই বা সে পথে নেমে এল কী করে? আমাকে যারা ভালবেসেছে তারা ত কই, কেউ আমার সঙ্গে ঘর ছেড়ে পথে নেমে আসতে রাজী হয়নি, জীর্ণ নড়বড়ে আশ্রয়—প্রেমহীন কুৎসিত জীবনকেই সে-আশ্রয়ে আঁকড়ে থেকে বাঁচতে চেয়েছে, ব্যাকুল হয়ে বলেছে, 'ডেকো না, ডেকো না। আসতে পারব না, নারীর শরীর পথে নেমে আসার যে কত বড় বাধা তা তুমি বুঝবে না।'

আমি কুন্তীকে জিজ্ঞেস করেছি, 'কুন্তী, ভালবাসার টানে তুমি পথে নেমে এলে কী করে, তোমার শরীর বাধা হল না, বাধা দিল না?'

কুন্তী হেসেছে, তার মুখ ভোরবেলার আকাশের মতন নরম এক আলোতে ভরে উঠেছে, বলেছে, 'ভালবাসার বেদীতে আমি শরীরকে পশুর মতন বলি দিতে পেরেছি। আমি তোমার জন্যে শরীর আনি নি, এনেছি ভালবাসা।

'ভালবাসার গায়ে যাতে আঁচড় না লাগে, তার না যাতে ক্ষতি হয়, সর্বাঙ্গ বিপদের দিকে ফিরিয়ে আমি তাকে অনুক্ষণ বুকে করে রেখেছি, তোমাকে দেব বলে। শরীর ঠুনকো ভোগের পাত্র সে থাক বা না থাক কী আসে যায় তাতে, আমি আমার শরীর অনায়াসে তাই যে-কোন বিছানায় পেতে দিয়েছি। শুধু ভালবাসাকে রক্ষা করেছি প্রাণপণে।'

আমি চমকে উঠলাম, বুঝলাম, এই এক শিক্ষা আমার বাকি ছিল। ভালবাসার শিক্ষা আমি পাইনি কোনদিন। এখন মনে পড়ছে, চিরকাল অনায়াসে পেয়েছি তাই অনায়াসে ভুলে গেছি, কিন্তু অনায়াসে কাউকে কিছুই দিতে পারিনি। সুরঞ্জনার মৃত্যুর কারণ এতক্ষণে আমি জানতে পারলাম। এখন পরিষ্কার হল, কেন নিশিলতা তার বাপের সঙ্গে ভেসে গেল। আসলে আমি কুন্তীর মতন ভালবাসতে শিখিনি। শুধু তাই নয়, ভালবাসা চিনতেও শিখিনি। ভালবাসা চেনার বিদ্যা যদি আমার জানা থাকত তবে নিশিলতা মরত না। সুরঞ্জনা মরত না। কুন্তী মরত না। আমার সমস্ত শিল্প-শিক্ষা যে কেন মিথ্যে হয়েছে, কেন যে আমি অপরূপকে রূপান্তরিত করতে পারিনি মূর্তিতে, কেন যে কেবল রূপই পুনঃপুন মূর্ত হয়েছে আমার প্রতিমায়, এখন বুঝলাম। বুঝলাম, ভালবাসতে জানলে ভালবাসাকে চিনলে তবেই জীবনের মৌল বোধে পোঁছা যায়। অরূপের বিশুদ্ধ রূপটি ভালবাসার মণিকোঠায় চাবি বন্ধ বলে, সে চাবি আমার নেই বলে, সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষের সার্থক স্বপ্নের সেই

অনন্য রূপ, মাতৃরূপ—যাকে আমি মূর্তিতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলাম—মূর্ত হল না।

কিন্তু আমি কি ভালবাসাকে মূর্ত করতে চেয়েছিলাম? আমি কি চোখে চোখে কেবল ভালবাসা দেখে এসেছি? কেম- সন্দেহ হল।

আমার সে সন্দেহ দূর করতেই বুঝি নিজের শরীরকে নৌকো করে ভাসতে পেরেছিল কুন্তী, এত দূরে আমার কাছে এসে পৌঁছতে পেরেছিল।

আমাদের বস্তিতে বসন্তের মড়ক লাগল। সে মড়কের প্রথম কামড়েই কুন্তীর দুর্বল শরীর কাত হয়ে পড়ল। মুখ বাদে গোটা শরীরটাই যেন ঘা হয়ে পচে গেল। ভীষণ ছটফট করত প্রথম দিকে। হাহাকার করত—'আমার ভালবাসাকে নিয়ে ঘর করতে, সুখী হতে এসেছি। বড় কষ্ট করে বড় দুঃখ সয়ে ভালবাসার দুয়োরে এসে পৌঁছেছি, এক্ষনি আমাকে কেড়ে নিও না মা।'

হ্যাঁ, তখনও সে মাঁকে দেখেনি তাই ভালবাসাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিল। তারপরে যেই মায়ের মূর্তি দেখল কুন্তী আর মুখে ভালবাসার কথা নেই, মুখে কেবল মা-মা বুলি। মুখে আশ্চর্য এক হাসি, গভীর একটা তৃপ্তির ছাপ। আমি অবাক হয়ে শুধোই, 'তুমি সর্বাঙ্গের এই ক্ষতের যন্ত্রণা সইছ কেমন করে, এমন করে হাসতে পারছ কী করে?'

'আমার আর কোন যন্ত্রণা নেই', ফিসফিস করে বলেছে কুন্তী, 'দেখছ না, মা আমার মাথা কোলে করে বসে আছেন, আমার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আহ্ মা কী অপরূপ, রূপ দেখলে সব যন্ত্রণা জ্বালা জুড়িয়ে যায়।'

'কুন্তী, মা দেখতে কেমন? তার চোখ জোড়া? কুন্তী, বল বল।'

'মায়ের রূপ কি বর্ণনা করা যায়? তুমি পাগল হয়েছ? .কে শুধু চোখ ভরে দেখতে হয়। মাকে শুধু চোখ বুজলে .খা যায়।'

কুন্তী ধীরে ধীরে চোখ বুজল। মায়ের রূপে বিভোর চোখ র মেলল না কুন্তী। আমার সব সন্দেহ নিরসন করে কুন্তী মরে গেল।

প্রতিদিনকার বিস্বাদ পৃথিবীতে বিবর্ণ জীবনযাপনের গ্লানিতে আমার আত্মা বাঁধা পড়েছিল কুন্তী মরে আমাকে সেই বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে।

আমি কুন্তীকে শ্মশানে রেখে নিঃসন্দেহ নির্মোহ স্বচ্ছ দুটি চোখ মেলে আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম।

উপসংহার

বেহালার বস্তিতে তার শেষ পদচিহ্ন এই ডায়্যারি রেখে গিয়েছিল শান্তনু। যেন আমাকে শেখাবে বলে। হয় না, হয় না, হয় না। শিল্প, কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত এভাবে হয় না কখনো, বুদ্ধির জাল ফেলে মাথার খুলির ভিতর থেকে তাকে ধরে নিয়ে আসা যায় না। জীবন যখন চরম যন্ত্রণা ও পরম সুখে একসঙ্গে তেলে পলতেয় দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, সব সংস্কার অন্ধ-বিশ্বাস প্রচলিত চিন্তা পুরানো বাড়ির মতন শাবল গাইতি হাতুড়ির ঘায়ে মুখ থুবড়ে পড়ে—তখনই মাকড়সার জাল, চামচিকে কেঁচো টিকটিকি আর অন্ধকার নিমেষে কোথায় পালিয়ে যায়, সব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অলৌকিক আলোতে—এই আলোই আত্মার জ্যোতি, রূপে রূপে যা আভাসিত হতে দেখেছিল শান্তনু, যার অর্থ কিছু বোঝেনি। বোঝা যায়ও না। বোঝবার জন্যে শুধু ভেঙে বেরিয়ে পড়তে হয় নিত্যকার অভ্যাসে অসুস্থ ব্যবহারিক পৃথিবী

থেকে ; তারপর মৌলবোধের দিকে লক্ষ্য রেখে ক্রমাগত নিজে দিকে হেঁটে যেতে হয়, যেতে যেতে অবশেষে মৃত্যুর দেউড়ি পার হ... সেখানে গিয়ে পৌঁছতে হয়—মায়ের কোলে। মায়ের কোলে ফি... যেতে চেয়েছিল শান্তনু। সে ইচ্ছা পুনঃপুন যোনিপথের দেউড়ি পেরিয়ে গর্ভে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষায় আত্মপ্রকাশ করেছে। আর, এক পরম সুখের স্পর্শে শিউরে উঠেছে শান্তনু, সে-শিহরিত সুখের আবেগে আচ্ছন্ন সে ক্রমাগত হেঁটে চলেছে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে নিজের সত্তার দিকে। যেতে হবে। এ যাত্রাই প্রত্যেক শিল্পী কবি সঙ্গীতকারের—প্রত্যেক স্রষ্টার দিব্য-দর্শনের উৎস! এই উৎসের দিকে শান্তনু হয়ত এখনও হাঁটছে। ক্ষুরের মতন ধার দূর দুর্গম সে-পথ।

আমি পারব না। শান্তনুর ডায়্যারি পড়ার পরে আমি বুঝতে পেরেছি, কোন মতে কিছু টাকা, নিরবচ্ছিন্ন অবসর ও নির্জনতা অর্জন করতে পারলে শেষে তক্তপোষে টান-টান হয়ে শুয়ে মনে-মনে মেরু-প্রদেশে যাওয়া যায় না। যারা মনে করে যাওয়া যায় তারা যাক। আমার এই প্রাত্যহিক জীবনের মলিন পৃথিবীই বরং ভাল, শান্তনুর মতন আমি যখন জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে পারব না, সে-সাহস সে-শক্তি যখন আমার নেই তখন কাজ কি সেই মহৎ ও বৃহতের চিন্তায় নিজেকে ক্লান্ত অবসন্ন বিভ্রান্ত করে। তার চেয়ে আর সকলের মতন চাকরি করব, বিয়ে করব। চাকরি একঘেয়ে হবে, বউ বিস্বাদ হবে, বিয়ের আসবাব নড়বড়ে হবে, দান-সামগ্রীর রং চটে যাবে বালিশ তোষক তেলচিটে হবে। তুলো উড়বে। আমি নিত্য নূতন সুখ খুঁজতে বস্তির খোপে অন্ধকারে ক্ষুধার্ত মাছির মতন ভন্‌ভন্‌ করব। আমি বিমল, বিমলেন্দু বিশ্বাস, প্রাণপণে একজন সাধারণ মানুষ হব।

সমাপ্ত